দাম : এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

জওহরলাল নেহরুর
স্মৃতির উদ্দেশে

সাবিত্রী রায়ের লেখা বই :

পাকা ধানের গান : তিন খণ্ডে ১২'৫০ ত্রিস্রোতা ৬'০০ মালশ্রী ৩'৫০

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে—মেঘনা আর পদ্মাপারের ভাঙাগড়ার পটভূমিতে লিখিত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনসংগ্রামের সুবৃহৎ উপন্যাস—

মেঘনা-পদ্মা ১৫'০০

সাবিত্রী রায়ের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে দু'একটি অভিমত—

"কোনও বাংলা উপন্যাসই, এমনকি শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবতাবোধ ও উৎকৃষ্টতর শিল্পনৈপুণ্য সত্ত্বেও তাঁদের উপন্যাস সাবিত্রী রায়ের 'পাকা ধানের গান'-এর মত এমন বিরাট চিত্রপট, রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোর এত মহান প্রণিধান, বিষয়বস্তু ও চরিত্রের এত বৈচিত্র্যময় অবতারণার দাবী করতে পারে না। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলোও (সৃজন, ত্রিস্রোতা, মালশ্রী প্রভৃতি) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তাঁর 'পাকা ধানের গান' মহাকাব্য সৃষ্টির মহৎ প্রচেষ্টা। এটি জনগণের মহাকাব্য —যাতে গণসংগ্রামের এক পর্ব ও পূর্ববঙ্গের জীবনযাত্রার একটি ধারা অত্যন্ত সততার সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে।............

সবশেষে এ বললে হয়তো অতিশয়োক্তি ও প্রশস্তির বাহুল্য হবে না যে সত্যের সার্থক মূল্যায়নে ও শিল্পপ্রতিভার চরম পরাকাষ্ঠার বিচারে এই জনগণের উপন্যাসটির প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ অপর কোন উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে নেই"

—সরোজ আচার্য : **নিউ-এজ**

*

"বর্তমান বাংলা উপন্যাসের বৈচিত্র্য সন্ধানী চটুল ঝঙ্কারের ভিতর পাকা ধানের গান ধ্রুপদ মন্দ্রিত, এর বিপুল সঙ্গীত বাংলা দেশের ধানের ক্ষেতের মতোই দূর দূরান্তে দিক্‌-দিগন্তে বিকীর্ণ হয়ে গেছে"—

—**পরিচয়**

*

"পাকা ধানের গান' একটি সাধারণ কাহিনী নয়; সেখানে রাজনীতির প্রশ্ন আছে, সমাজ জিজ্ঞাসা আছে।......প্রেম নামে স্নিগ্ধ স্বপ্ন আছে। দেশ নামে প্রবল কর্তব্য আছে। একদিকে ব্যক্তিমানস আর একদিকে বিশাল দেশের বিপুলতর আহ্বান। লেখিকার অপরূপ এক কবি মন আছে। বাংলা দেশের লোকাচার, ব্রতকথা অপূর্ব মমতায় তিনি এই কাহিনীতে অঙ্গীকৃত করেছেন"

—**দেশ**

*

"সাবিত্রী রায়কে ধন্যবাদ, পল্লীজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুন্দর সুখপাঠ্য উপন্যাস তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই বইয়ে এমন একটি কোমল ও শান্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, যা খুব সুলভ নয়—"

—**আনন্দবাজার পত্রিকা**

*

জীবনের যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র উপাখ্যান সাবিত্রী রায় সংগ্রহ করেছেন তা যে কোন জীবননিষ্ঠ ঔপন্যাসিকের ঈর্ষাযোগ্য..."

—**যুগান্তর পত্রিকা**

মিত্রালয় ॥ ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আমাদের কালের মৌল সমস্যাবলী

সম্পর্কে

বিশিষ্ট মার্কসবাদী

লেনিনবাদী

এন. এস. ক্রুশ্চফ



সাম্রাজ্যবাদ—জনগণের শত্রু, শান্তির শত্রু

সাম্রাজ্যবাদের দস্যু প্রকৃতির বলিষ্ঠ উদ্‌ঘাটন—এক পারমাণবিক যুদ্ধের প্রলয়কাণ্ডের দিকে যা বিশ্বকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে। গ্রন্থকার সাবলীল বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি না বদলালেও, সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান শক্তির দ্বারা যুদ্ধের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে দেওয়া গেছে। এই মহাশক্তি বিশ্বকে এক পারমাণবিক প্রলয়ের দিকে ঠেলে দেওয়ার সবরকম চেষ্টাকে প্রতিহত করে দেবার ক্ষমতা রাখে। দাম : ২৫ ন. প.

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ

কমিউনিজমের গঠনকাণ্ডের মূল সমস্যাবলী, সমাজতন্ত্রের অবস্থান ও সাফল্যগুলির সংহতিসাধন এবং দুই ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা। দাম ৪০ ন. প.

বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট আন্দোলন

বর্তমান যুগের শ্রেণীসংগ্রামের এবং সাম্রাজ্যবাদের চরম পতনের ও সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের সংগ্রামে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির ভূমিকার সুগভীর বিশ্লেষণ (পৃথিবীর প্রায় ৯০টি দেশে এই পার্টিগুলি রয়েছে, যার সর্বমোট সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ৪২ কোটিরও বেশি।) দাম : ২৫ ন. প.

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশ-বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ের বিশ্লেষণ, এতে দেখানো হয়েছে যে উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রাম ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কী অপরিসীম সাহায্য ও পথনির্দেশ করে চলেছে। গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে কোন পথ ধরে এগোতে হবে। দাম : ২০ ন. প.

যুদ্ধ রোধ করা আমাদের মূল কর্তব্য

বর্তমান দুনিয়ায় শক্তির ভারসাম্য এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনবাদী নীতিটি সমগ্র বিশ্বের জনগণের মূল স্বার্থকে কিভাবে পরিপুষ্ট করে তুলছে, তার এক সুগভীর বিশ্লেষণ। (দাম : ৪০ ন. প.)

৫টি বই একত্রে ১'৯০

প্রাপ্তিস্থান—**মনীষা**, ৪।৩-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

কালান্তর প্রকাশনী, ৫৯।১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯

পরিচয়

বর্ষ ৩৩। সংখ্যা ১১
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

সূচীপত্র

জওহরলাল নেহরু ॥ সম্পাদকীয়

গ্যালিলিও গ্যালিলি ॥ মনোজ রায় ৪৪৩

কবিতাগুচ্ছ

অন্তিম নির্দেশ ॥ শেভচেনকো (অনুঃ নীরেন্দ্রনাথ রায়) ৪৫৯

বৃক্ষের ভাগ্যকে ঈর্ষা করি ॥ পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী ৪৬১

প্রতীক্ষার দিনগুলি ॥ চিত্ত রায় ৪৬২

ঘাতক ॥ সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৪৬২

প্রদক্ষিণ ॥ অশোক পালিত ৪৬৩

কবি বিদ্রোহী প্রসঙ্গে ॥ আবদুল আজীজ আল্-আমান ৪৬৪

খোকন গেছে কার নায় ॥ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭১

রূপনারানের কূলে ॥ গোপাল হালদার ৪৮৫

শেক্স্পিয়রের কাল ॥ অমলেন্দু বসু ৪৯৬

উইল শেক্সপীয়র : একটি কল্পনা ॥ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৫৩১

পুস্তক পরিচয় ॥ শচীন বসু, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল ৫৪১

চলচ্চিত্র-প্রসঙ্গ ॥ ধ্রুব গুপ্ত ৫৪৯

পাঠকগোষ্ঠী ॥ সিতাংশু ভট্টাচার্য ৫৫৬

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

বিশ্বপরিস্থিতি তথা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র মাসিকপত্র

আন্তর্জাতিক

প্রধান সম্পাদক : **বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়**

প্রকাশক : **পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদ**

প্রতি সংখ্যা—পঞ্চাশ নয়া পয়সা ; বার্ষিক চাঁদা—ছয় টাকা
ষান্মাসিক চাঁদা—তিন টাকা

১৪৪, ধর্মতলা ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১৩
২৪-৩৯৩০

সম্পাদকীয়

জওহরলাল নেহরু

জওহরলাল নেহরু অকস্মাৎ অস্তমিত হলেন। ৭৪ বৎসর পূর্বে ইং ১৮৮৯-এর ১৪ই নবেম্বর এলাহাবাদে যে-জীবনের যাত্রারম্ভ আজ ইং ১৯৬৪-এর ২৭শে মে নয়াদিল্লীতে তার প্রিয় জন্মভূমি ও প্রিয় পৃথিবীর কাছ থেকে সে চিরবিদায় গ্রহণ করল।

ভারতবর্ষের মহাসৌভাগ্য যে, একই যুগে একই দেশে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও জওহরলালের আবির্ভাব ঘটেছে। আমাদের ইতিহাসে এমন যুগ আর কখনো আসে নাই, পৃথিবীর কয়টি দেশের ইতিহাসেই বা এমন যুগ বেশি আসে? তাই তো জওহরলালের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে শোকমুহ্যমান্ জাতির মনে আজ এতটা বেদনা ও বিহ্বলতা, আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা। এ তো শুধু কোনো মহান্ জাতীয় নেতার বিদায় নয়, এ যে প্রতি ভারতবাসীর প্রিয়জনবিয়োগ, পৃথিবীর প্রতি মানুষের বন্ধুবিয়োগ, ভারতেতিহাসের সেই মহাযুগের অবসান যে-যুগ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সঙ্গে উদিত আর জওহরলালের সঙ্গে আজ অস্তমিত।

জওহরলালের জীবন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে যুগ-সত্যের উদ্‌যাপনের ইতিহাস, রাজনৈতিক গণনায় যা যুগ থেকে যুগান্তর যাত্রার ইতিহাস। এক জীবনের মধ্যেই একাধিক যুগের প্রয়াণ-প্রকাশ তাতে বিধৃত, আভাসিত ও বিকশিত।

জওহরলাল যখন রাজনীতিক ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনের চক্ষের মোহাঞ্জন তখন পর্যন্ত মুছে যেতে-যেতেও মুছে যায় নি। এই সুদূর পূর্বকোণে দুঃসাহসী স্বদেশীদের বুকে যতই জেগে থাকুক আবেদন আর নিবেদনের বিরুদ্ধে বিরূপতা ও বিক্ষোভ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মোহপাশে গান্ধীজীও তখন পর্যন্ত আবদ্ধ। এ ভালোই হয়েছিল যে, জওহরলাল এসেছিলেন হ্যারো-কেম্‌ব্রিজের প্রাণ-প্রাচুর্যপূর্ণ যৌবনের দৃষ্টি নিয়ে, অন্য দিকে

সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন স্বদেশীর বিদ্রোহ-ঐতিহ্যের দৃপ্তি নিয়ে। ঔপনিবেশিক রাজনীতির হিসাব-করা কথা ও কর্মে তাঁদের কারোরই মুক্তিপ্রয়াসী মন তৃপ্তি পেতে পারে না। জওহরলালের ব্রিটিশ স্বাধীনতায় পরিপুষ্ট মন সে প্রসাদজীবী রাজনীতি সহজেই অগ্রাহ্য করে।

ভাগ্যের কথা, সেই 'আবেদন আর নিবেদনের' রাজনীতি ছাড়িয়ে ভারতীয় আন্দোলন যখন মুক্তি-সাধনার সক্রিয় আন্দোলনে রূপায়িত হয় সেই ঐতিহাসিক ক্ষণে জওহরলাল পেয়েছিলেন গান্ধীজীর সস্নেহ আশ্রয়। তাই গণ-আন্দোলনের পথে তিনি লাভ করলেন জাতির সাধারণ মানুষের প্রাণস্পর্শ। অনুভব করলেন তাঁদের বহু পুঞ্জিত দারিদ্র্যের দুর্বহতা, অধিকার-বঞ্চিত জীবনের শূন্যতা, অজ্ঞান-আবৃত চিত্তের অসহায়তা। বিলাসী পরিবারের বিলাতে-শিক্ষিত একমাত্র পুত্রের ভাগ্যে এই অভিজ্ঞতা না জুটলে তিনি ভারতবর্ষকে আপনার করতে পারতেন না। দেশ অর্থ যে দেশের মানুষ,—দেশকে ভালোবাসার অর্থ যে দেশের মানুষকে চেনা, জানা, সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে তাদের আপনার হয়ে ওঠা, সেবার মধ্য দিয়ে তাদেরকে আপনার করে পাওয়া,—রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশীব্রতের শিক্ষা পণ্ডিত জওহরলালের নিকট তখনো পৌঁছবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি তা আহরণ করেছিলেন গান্ধীজীর শিষ্যত্বে, গণ-আন্দোলনের কার্যগত সূত্রে, গ্রামে শহরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রাণের সংযোগে। এই ভারত-পরিচয়ই জওহরলালের 'ভারতাবিষ্কারের' বাস্তব ভিত্তি।

কিন্তু আরও ভাগ্যের কথা, ভারতৈতিহ্যের গান্ধীবাদী ভাবনার দ্বারা সীমিত না হয়ে জওহরলাল জাগ্রত হলেন যুগসত্যের ঐতিহাসিক চেতনায় ত্রিশের কোঠায়। আর তারই ফলে সেই যুগসত্যের আলোকে উপলব্ধি করলেন ভারতেতিহাসের মহদভিপ্রায়—মানব মহা-ইতিহাসে আধুনিক কালের জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, কর্মে ও প্রেমে, আদর্শে ও সাধনায় ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতেই তার মুক্তি-সাধনার সম্পূর্ণতা। এই চেতনা হ্যারো-কেমব্রিজের আধুনিক শিক্ষায় হয়তো দুর্লভ হত না। কিন্তু সেই শিক্ষায় দুর্লভ হত নিপীড়িত সকল মানুষের সকল সংগ্রামের মধ্যে এই ঐক্যবোধ, মানবেতিহাসের সেই সামগ্রিক চেতনা, মহামানবের সমাগত মুক্তিতে সেই গভীর আস্থা। পরাধীন জাতির মর্মবেদনা দিয়ে জওহরলাল পেয়েছিলেন সকল জাতির মুক্তিসংগ্রামের সেই অখণ্ডতাবোধ। ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরতর উপলব্ধি থেকে পেয়েছিলেন 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের' সেই মন্ত্র। আর, তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও সোভিয়েত রুশের অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছিলেন সমাজতন্ত্রী জীবন-রূপায়ণের প্রত্যক্ষ শিক্ষা।

ত্রিশের কোঠা থেকে তাই ভারতীয় গণ-আন্দোলন ঐতিহাসিক নিয়মে গান্ধীপর্ব থেকে জওহরলালের পর্বে উত্তীর্ণ হতে থাকে। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে—পৃথিবী-জোড়া ফাশিজম-এর তাণ্ডবকালে—রবীন্দ্রনাথের ভাব-সাধনা যেন রাজনীতিক কর্মযোগে অনুসৃত হবার আয়োজন হল। জওহরলালের সত্তায় রবীন্দ্র-গান্ধী-সমৃদ্ধ ভারতেতিহাসের সেই যুগের যেন এল সমন্বয়ের রূপ। সে যুগের ইতিহাসে জওহরলালের এইটিই বিশেষ ভূমিকা—জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টির সঞ্চার, ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে সর্বদেশীয় মুক্তি-আন্দোলনের অঙ্গীভূত করে জানা, আর জাতীয় গণতন্ত্রী আন্দোলনকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের লক্ষ্যাভিমুখী করে গণ-আন্দোলন রচনা।

তারপর স্বাধীনতার প্রভাতে দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই জওহরলাল গ্রহণ করলেন স্বাধীন ভারত রূপায়ণের দায়িত্ব। তার অসম্পূর্ণতা অজ্ঞাত নয়। যে মহাজাতির দায় তিনি গ্রহণ করেন তাকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের নাতিবন্ধুর পথে বিপ্লবের ফলভাগী করা যেমন দুষ্কর, তেমনি সেই বিভেদবিচ্ছিন্ন দেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে তাকে গণবিপ্লবের দুঃসাহসিক অভিযানে প্রণোদিত করাও দুঃসাধ্য। যুগের বাস্তব সাক্ষ্য মনে রেখেই ইতিহাস করবে জওহরলালের বিচার। ইতিহাস কি ভুলতে পারবে—পঞ্চাশ কোটি লোক নিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের এই বৃহত্তম আয়োজন মানবেতিহাসে কত অভিনব? পৃথিবীব্যাপী বিপর্যয়ের মুখে শত বিভাগ-বিদীর্ণ দেশে এই ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পোষণ কী কঠিন সাধনা? বহু যুগের অচলায়তন পেরিয়ে এই সুপ্রাচীন দেশের দিকে দিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আরব্ধ নতুন উদ্যোগ, নতুন প্রকল্প, নতুন যোজনা কত বড় দুঃসাহসিক সূচনা? আণবিক শক্তিমত্ততার যুগে অস্ত্রহীন, দর্পহীন, জোট-নিরপেক্ষ এক নতুন শক্তির আন্তর্রাষ্ট্রিক আসরে বিশ্বমুক্তির ও বিশ্বশান্তির উদ্গাতারূপে সকলের স্বীকৃতিলাভ, প্রীতিলাভ, শ্রদ্ধালাভ—পৃথিবীর ইতিহাসে কত বড় সুসংবাদ?

আর সর্বশেষে, ইতিহাস কি একেবারে বিস্মৃত হবে রাজনৈতিক সমস্ত ধূলিধূসরতায়, জয়-পরাজয়ের মধ্যেও মানবিক মূল্যবোধেই মানুষের পরম পরিচয়? যে অম্লান জীবনবোধ সংগ্রামের শত উগ্রতার মধ্যেও মানুষে মানুষে সম্পর্ককে করেছে শোভন ও সুন্দর, শিল্পে-সাহিত্যে চিত্রে নৃত্যে নাট্যে—ক্রীড়াক্ষেত্রে, নর্ম-নিবেদনে—দেশের অন্তর্লক্ষ্মীকে সকল শ্রীতে, সকল শক্তিতে বিকশিত করা ছিল যাঁর স্বপ্ন, আকাশের তারায় আর শিশুর মুখে যিনি ধ্যানসুন্দর নেত্রে দেখতেন জীবন-লক্ষ্মীর রহস্যময় প্রকাশ—তাঁর পরিমাপ তো শুধু কর্মে নয়,—জ্ঞানে আর প্রেমেও। তিনি তো শুধু একটি পথের স্রষ্টা নন—সমস্ত ভুল আর সত্যসুদ্ধ তিনি একটি যুগের পরিচয়—যে-যুগ রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-জওহরলালের যুগ—ইতিহাসে মানবতার সাধনার একটি মহৎ অধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-জওহরলালের যুগ শেষ হল, ইতিহাসের শেষ নাই। যুগ-প্রয়াণের মধ্যেই থাকে তা উত্তরণের বাণী। জওহরলালের পরে আছে সেই নতুন যুগের উত্তরাধিকারী। কোনো একজন ভারতীয় নেতা নয়, ভারতের জনতা। নামহীন, যশোহীন, অভিমানহীন সেই জনসমাজই আজ জওহরলালের উত্তরাধিকারী—নতুন জওহরলাল, মহত্তর জওহরলাল, এ বাণীর সার্থক স্বাক্ষর : 'জওহরলাল অমর রহে'।

রইল সকল জওহরলালের উদ্দেশে 'পরিচয়'-এর সশ্রদ্ধ প্রণাম!

মনোজ রায়

গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২)

খ্রীষ্টীয় ইয়োরোপের বিজ্ঞানচিন্তার পটভূমিকাতেই গ্যালিলিও সম্পর্কিত আলোচনা স্বাভাবিক কারণে সীমাবদ্ধ থাকবে। তাই নবম ও দশম শতকে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম বিদ্যোৎসাহিতা থেকে বিজ্ঞান-প্রয়াসের বিচিত্র ধারাকে অনুসরণ করা যাক। তখন স্পেন, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে আরব্যবিজ্ঞান ও সভ্যতা শিখরস্পর্শী। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার সমকালীন ইয়োরোপের সঙ্গে প্রাচ্যদেশীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের যা কিছু পরিচয় তা আরবী ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে। দ্বাদশ শতকে মুসলিম সভ্যতা যখন নিম্নগামী তখন খ্রীষ্টীয় ইয়োরোপে ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা প্রকাশ পায়। ইতিহাসের এই যুগসন্ধিতে প্রথম রেনেসাঁসের সূত্রপাত, ইয়োরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতার পুনর্জন্ম। ইহুদী অনুবাদকদের কল্যাণে মুসলিম দুনিয়ার বিজ্ঞানচিন্তা প্রবাহিত হয় ইয়োরোপের দিকে। প্রাচ্য ও আরব্যবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ে অনুপ্রাণিত হবার পর এবার ইয়োরোপের দৃষ্টি পড়ে প্লেটো-অ্যারিস্টটল্ প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকগণের বিস্মৃত চিন্তাসম্পদে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের ধারণা হয়, এই চিন্তাসম্পদের মধ্যেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সত্যগুলি নিহিত রয়েছে; নতুন কোনো সত্যের সন্ধানে মননশীলতার অবকাশ নেই। তবে খ্রীষ্টীয় ধর্মালোকে বিধর্মী পৌত্তলিক গ্রীকদের দর্শনচিন্তার সংস্কার-শুদ্ধির প্রয়োজন আছে। এই উপলব্ধি থেকেই ত্রয়োদশ শতকের পণ্ডিতীয় যুগে খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের সমন্বয়। এর ফলে বিজ্ঞানচিন্তার স্বাধীনতা বিশেষভাবে সংকুচিত হয়। স্বাধিকারপ্রমত্ত ধর্মসংস্থা মানুষের আত্মিক পবিত্রতা সংরক্ষার দায়িত্ব ছাড়িয়ে তার মননশীলতার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। ফলস্বরূপ দেখি, পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতা এমন একটা স্থবির

যুগে এসে পৌছেচে, যেখানে প্রচলিত বিশ্বপরিকল্পনা দ্বিতীয় শতকের টলেমীর চিন্তাপ্রসূত, জ্ঞান-বিজ্ঞানে যা চরম সত্য বলে গৃহীত তার মূর্তিমান বিগ্রহ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের অ্যারিস্টটল। পণ্ডিতদের কাছে আর্ষবাক্য শিরোধার্য, আর শিক্ষার্থীরা কিছুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ না করে প্রাচীন পুঁথিপত্রের বিষয়বস্তুকে নিঃশেষে কণ্ঠস্থ করতে যত্নবান। মননশীলতার এই সংকট থেকে মুক্তি, খ্রীষ্টীয় ধর্মদর্শন থেকে বিজ্ঞানচিন্তার বিচ্ছেদ, মধ্যযুগের সভ্যতার মন্দ-প্রগতিকে স্রোতস্বিনী করে তোলার জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন হয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে। সাধারণভাবে রেনেসাঁস-অভিহিত এ যুগের স্বরূপ মুখ্যত বৈজ্ঞানিক ছিল না, সর্ববিষয়ে আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা তার বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগীয় মানসক্রিয়ার মধ্যে একটা পণ্ডিতীয় আবরণ ছিল, সে আবরণ ধীরে ধীরে খুলে পড়তে থাকে। আপাত-অক্ষয় সনাতন ধারণাকে আশ্রয় করে নানা জল্পনাকল্পনা জড়ো না করে তার পরিবর্তে নতুন কোনো সত্যের সন্ধানে মানুষ মননশীল হয়ে উঠে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রণশিল্পের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবধারার দ্রুততর প্রসার সম্ভব হয়। একই সময়ে মধ্যযুগের ধর্মীয় ঐক্যে ভাঙ্গন ধরে এবং সমকালীন মানসিকতা ভাবসংঘাত ও প্রগতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারা সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহ দেখা যায়, অ্যারিস্টটলের চেয়ে প্লেটোর সমাদৃতি বাড়ে। লিওনার্দো দা ভিন্‌চির মতো অভিযাত্রী শিল্পীর বহুমুখী প্রতিভার ছোঁয়াচ লেগে নন্দনশিল্প থেকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সজীব হয়ে উঠে। লিওনার্দো ও বত্তিচেলি কর্তৃক অনুসৃত শিল্পরীতির উপজীব্য ছিল শারীর সংস্থান ও পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা। তার অনুষঙ্গ হিসেবে জ্যামিতির যে পরিশীলন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল তা পরোক্ষভাবে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করে। ইতালীয় রেনেসাঁসের মূল ধারা থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন এ যুগের অন্যতম চিন্তাবিদ কোপার্নিকাস। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সূর্যকেন্দ্রীয় বিশ্ব-পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়।

রেনেসাঁস এবং তার পূর্ববর্তী যুগের বিজ্ঞান-প্রয়াস নানাদিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। কারণ হিসেবে দুটি অভাবের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রথমত জ্ঞানের বিশেষ বিভাগে ব্যুৎপত্তি, দ্বিতীয়ত কোনো নতুন মত বা আবিষ্কারের সত্যতা ও প্রয়োগ-সম্ভাবনাকে বিচার করে দেখবার মতো সচেতন বিজ্ঞানীগোষ্ঠী। লিওনার্দো কাজ করেছেন সম্পূর্ণ একা, তাঁর উদ্‌ভাবিত তথ্য প্রকাশের জন্য তাঁকে কেউ প্ররোচনা বা উৎসাহ দেয় নি, যা নিউটন পেয়েছিলেন হ্যালীর

কাছ থেকে। ফলে অনেক নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তার অবলুপ্তি ঘটেছে প্রকাশের আগেই। তদুপরি ছিল গোপনীয়তা রক্ষা এবং যে সকল সমস্যার সমাধান আপাত-দুঃসাধ্য তাকে ঘিরে একটা মরমিয়া রহস্য সৃষ্টি করার প্রয়াস। এর ফলে বিজ্ঞান জগতে ভাবধারার বিনিময় এবং বিভিন্ন ধারণার পারস্পরিক ব্যাহত হয়েছিল। পদার্থের ধর্ম ব্যাখ্যার জন্য গুরুত্ব (gravity) লঘুত্ব (levity) এই রকম কতকগুলি বিরুদ্ধ গুণ-প্রকাশক শব্দযুগল প্রচলিত ছিল। তাপ তখন পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত আলোচ্য বিষয় নয়, রাসায়নিক মৌল-বিশেষ। কিমিয়াবিদ্‌দের চিন্তাজগতে বস্তু আর বিমূর্ত একাকার হয়ে বিধৃত। সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে অ্যারিস্টটল যে-সব সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন, সেগুলো ধর্মশাস্ত্রে ও খ্রীষ্টীয় ইয়োরোপের চিন্তাদর্শনে স্বতঃপ্রমাণ ও অখণ্ডনীয় সত্য বলে গৃহীত হয়েছিল। এই দৃঢ়মূল মতবাদের পরিপন্থী চিন্তা ও উদ্‌ভাবন ছিল অবাঞ্ছনীয়। মধ্যযুগের প্রান্তিক ভাগে ইয়োরোপীয় সভ্যতার দৈন্য ও শূন্যতার মধ্যে মুষ্টিমেয় একক কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল। এই সময় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে মরমীবাদের আচ্ছাদন থেকে মুক্তি দেবার নিরর্থক প্রয়াস দেখা যায়। এমনকি রেনেসাঁস যুগেও প্যারাসেল্‌সাস্, করডাস্ ও এগ্রিকোলার প্রথাবিরুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চা তেমন সার্থক হয় নি। বস্তুত আধুনিক কাল পর্যন্ত অ্যারিস্টটলপন্থীদের প্রবল বিরোধিতার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানকে প্রতিটি পদক্ষেপ করতে হয়েছে।

ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান-প্রগতির পরিপন্থী অ্যারিস্টটলীয় দর্শনে চতুর্দশ শতকের গোড়াতেই জঁ৷ বুরিদাঁ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তারপর রেনেসাঁস যুগে লিওনার্দো দা ভিন্‌চি অ্যারিস্টটলীয় বলবিদ্যার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। কিন্তু তখন গণিত বিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় রয়ে গিয়েছিল বলে বলবিদ্যা ও উপস্থিতিবিজ্ঞানে নিহিত তত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী হয়েও লিওনার্দো কোনো গাণিতিক সূত্র রচনা করে যেতে পারেন নি।

ষোড়শ শতাব্দী চিন্তাধারায় মধ্যযুগীয়, তার দৃষ্টি প্রকৃতিবিমুখ, সনাতন চিন্তা ও ধর্মশাস্ত্রের প্রভাবকে অতিক্রম করে রেনেসাঁসের অঙ্কুরিত বিপ্লবকে সে খুব বেশি সার্থক করতে পারে নি ধর্মসংস্থার সংকীর্ণ মনোবৃত্তি ও নিপীড়নের জন্য। একটা আমূল পরিবর্তন ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব যে আসন্ন তার পূর্বাভাস দিয়ে ষোড়শ শতাব্দী শেষ হয়। রেনেসাঁস পেরিয়ে সপ্তদশ শতকে আধুনিক বিজ্ঞান যুগের শুরু। এই দুই শতাব্দীকে যুক্ত করেছে জিওর্দানো ব্রুনোকে জীবন্ত দগ্ধ করার কলঙ্ককাহিনী।

সপ্তদশ শতাব্দীকে চিন্তা ও কর্মে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁরা হলেন নেদারল্যাণ্ডের স্পিনোজা, ফ্রান্সের দেকার্ত ও প্যাস্কাল, জার্মানীর লাইবনিৎস্, হল্যাণ্ডের হাইজেন্স্, ইংল্যাণ্ডের হার্ভে, নিউটন ও হুক এবং ইতালীর গ্যালিলিও। এঁদের মধ্যে অনেকেই জন্মেছিলেন এবং লালিত হয়েছিলেন রেনেসাঁসের চিন্তাবিপ্লবের পরিবেশে। গ্যালিলিও গ্যালিলি, প্রাচীন তাস্কান্ প্রথা অনুসারে কুলনামের এই দ্বিত্ব। আজ থেকে চারশো বছর আগে, ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মিকেলাঞ্জেলোর মৃত্যু এবং শেক্সপীয়র ও গ্যালিলিওর জন্মের বছর। শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য জন্ম-মৃত্যুর আশ্চর্য যোগাযোগে অবিস্মরণীয়।

একটা সাঙ্গীতিক পরিবেশে প্রতিপালিত হওয়ার জন্যই বোধ হয় গ্যালিলিওর মধ্যে স্বাভাবিক সঙ্গীতপ্রবণতা জন্মেছিল ; সেই সঙ্গে গণিতে অনুরাগ। যৌবনে তিনি দান্তের *Divina Commedia*-তে বর্ণিত Inferno সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে তার বৃত্তের পরিমাপের চেষ্টা করেন কবির বর্ণনা অনুসারে। এই প্রবল গণিত-অনুরাগের জন্য গ্যালিলিওর চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ অসমাপ্ত থেকে যায়। এই সময়ই দোলকের ধর্ম নিয়ে পরীক্ষার মধ্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার প্রকাশ। পিসা ক্যাথিড্রালে একদিন নীরস ধর্মোপদেশ শুনতে শুনতে ক্লান্ত গ্যালিলিও ঝোলানো দীপাধারের দোলন লক্ষ্য করেছিলেন। এ কাহিনীতে অতিরঞ্জন আছে কি নেই তা অবান্তর। হয়তো অনেকেই ধর্মোপদেশে ঐকান্তিক না হয়ে সেদিন অলস দৃষ্টি ফেলেছিলেন দোদুল্যমান দীপাধারের দিকে। কিন্তু গ্যালিলিও ঘড়ির বিকল্প হিসেবে নাড়ী স্পন্দনের সাহায্যে দোলনের বিস্তার ও দোলনকালের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের যে চেষ্টা করেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লক্ষ্য করেন, দোলন সংকুচিত বা প্রসারিত যাই হোক না কেন, দোলনকাল সমান। এই আবিষ্কারকে তিনি প্রয়োগ করেছিলেন নাড়ীর স্পন্দন মাপবার জন্য সময়-নিরূপক যন্ত্রের পরিকল্পনায়। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে এই যে দৃষ্টিভঙ্গি ও সচেতন মানসতার পরিচয় গ্যালিলিও দিয়েছিলেন তা ষোড়শ শতকে সম্পূর্ণ নতুন।

গাণিতিক প্রতিভা এবং পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণে স্বাভাবিক প্রবণতা ও নৈপুণ্যের স্বীকৃতিতে তরুণ গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদ লাভ করেন। এখানেই বস্তুর পতন ও গতি-সম্পর্কিত গবেষণার সূত্রপাত হয়। প্রতিপদে তিনি পূর্বাচার্যদের মতে সন্দেহ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি, নিজের প্রত্যেকটি

সিদ্ধান্তের অনুকূলে পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের সন্ধান করেছেন। তাঁর কার্যকলাপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্রমশ বিরূপ হয়ে উঠেন। যে অ্যারিস্টটলীয় মতবাদ স্বতঃপ্রকাশ ও ধ্রুবসত্য হিসেবে স্বীকৃত তার সমালোচনায় গ্যালিলিওর অসংযত মুখরতা এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব, সর্বোপরি, জিওভ্যানি দ্য মেদিচি কর্তৃক উদ্ভাবিত এক অকেজো পাম্পযন্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিন্দাসূচক মন্তব্যের ফলে পিসার পরিবেশ প্রতিকূল হয়ে উঠে। তিন বছর অতিক্রান্ত হবার পর যখন পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্নিয়োগের সময় আসে তখন গ্যালিলিও সেখানে অবাঞ্ছিত। সঙ্গে সঙ্গে স্বাগত আহ্বান আসে পদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

সমকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলারকে লিখিত পত্র থেকে আভাস পাওয়া যায়, ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোনো এক সময়ে গ্যালিলিও টলেমীর ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষ বর্জন করে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদে বিশ্বাসী হন। প্রকৃতপক্ষে গ্যালিলিওর জ্যোতিষীয় গবেষণা শুরু হয় ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে, সার্পেণ্টারিয়াস তারামণ্ডলে একটি নতুন নক্ষত্রের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে। কেপলার ও গ্যালিলিও নিঃসংশয়ে বলেন, নতুন নক্ষত্রটি সেই জ্যোতিষ্কলোকের অধিবাসী, যেখানে অ্যারিস্টটল-টলেমীর জ্যোতিষ অনুযায়ী নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু নেই। এর বছর তিরিশেক আগে ক্যাসিওপিয়া তারামণ্ডলে দেখা নতুন নক্ষত্র সম্পর্কে টাইকো ব্রাহে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। প্রাচীন জ্যোতিষীয় মতবাদের অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করে গ্যালিলিও প্রকাশ্যভাবে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদ সমর্থন করেন।

দূরবীক্ষণের উদ্ভাবক হান্স্ লিপেরশে কখনো আকাশ-সন্ধানের কথা ভাবেন নি। লিপেরশের দূরবীক্ষণ সম্পর্কে জনশ্রুতি শুনেই গ্যালিলিও ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুরূপ একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। দূরবীক্ষণের সামরিক উপযোগিতার সম্ভাবনায় যখন ভেনিস দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা উত্তেজিত, লিপেরশে যখন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য মোটা পারিতোষিকের প্রত্যাশী, তখন গ্যালিলিও তাঁর দূরবীক্ষণ স্থাপন করেন আকাশের দিকে। আকাশ পরিদর্শের কোনো আগ্রহ সে যুগের বিদ্বৎসমাজে দেখা যায় নি। গ্যালিলিওর সহকর্মিগণ তাঁর দেবতাহীন ঐন্দ্রজালিক নলের ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে

দৃষ্টি দিতে রাজী হন নি। এই সনাতনপন্থীরা বিশ্বাস করতেন, সূর্য, চন্দ্র, আর পাঁচটি গ্রহ মিলিয়ে জ্যোতিষ্কের সংখ্যা সাত, এই পবিত্র সংখ্যার বাইরে আর কোনো জ্যোতিষ্কের কল্পনাই করা যায় না।

দূরবীক্ষণের সাহায্যে গ্যালিলিও যে-সব আবিষ্কার করেন তা সনাতনপন্থীদের বিশ্বাসকে প্রচণ্ড আঘাত করে। দেখা যায়, তাঁদের কল্পনার পবিত্র সংখ্যা ছাড়িয়ে আকাশমণ্ডপে বহুতর জ্যোতিষ্কের সভা—অনেক নতুন নক্ষত্র, নীহারিকা, ছায়াপথে আকীর্ণ সংখ্যাতীত তারকাপুঞ্জ, বৃহস্পতির উপগ্রহ। প্রাচীন জ্যোতিষীয় ধারণায় যে চাঁদ ছিল একটি নিষ্কলঙ্ক স্বর্গীয় গোলক, দেখা যায় তা পৃথিবীর মতোই অসমতল। গ্যালিলিও শনিবলয়ের অংশবিশেষ, সৌরকলঙ্ক, সৌরাবর্তন ও শুক্রকলা আবিষ্কার করে কোপার্নিকাস সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। দূরবীক্ষণের সাহায্যে জ্যোতিষ্কলোকের সন্ধানের ফলাফল আংশিক প্রকাশিত হয় ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে *Sidereus Nuntius* (তারকা বার্তা) শীর্ষক পুস্তিকায়। গ্র্যাণ্ড ডিউক কসিমো দি মেদিচিকে উৎসর্গীকৃত মাত্র চব্বিশটি পাতা, তার মধ্যে অসীম জ্যোতিষ্কলোকের কত রহস্য বাঙ্ময়। প্রাচীন বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করে গ্যালিলিও এই যে আকাশের সীমাকে লক্ষগুণ প্রসারিত করেন, সূর্যকে ঘিরে গ্রহের, গ্রহকে ঘিরে উপগ্রহের পরিক্রমণ, তাঁর জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের এই যে সংশয়াতীত সিদ্ধান্ত তা কোপার্নিকাস নামীয় এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর বিশ্বচিত্রের সমর্থন জুগিয়েছিল শুধু তাই নয়, এই সিদ্ধান্ত আঘাত করেছিল খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের মূলে। অথবা বলা যায় ধূলিসাৎ করেছিল মানুষের স্বর্গলোকের কল্পনাকে, স্বর্গীয় আলোকে ভাস্বর চাঁদগ্রহের পবিত্র স্বপ্নকে ; সংক্ষেপে The heavens are the heavens of the Lord ; But the earth hath he given to the children of men এই ভ্রান্তিবিলাসকে। *Sidereus Nuntius*-এ আলোচিত তথ্যসমূহের সঙ্গে কোপার্নিকাসের চিন্তাধারার কোনো যোগাযোগের কথা স্পষ্ট করে উল্লিখিত হয় নি। অ্যারিস্টটল-টলেমীয় বিশ্বপরিকল্পনার অলীকতা সম্পর্কে ইঙ্গিত যে বিতর্কের সূত্রপাত করে তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল চাঁদ, অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ, এমনকি নক্ষত্রলোকে প্রাণের সম্ভাবনার প্রশ্ন। আমাদের এই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বকে ঈশ্বরের মহত্তম লীলা বলে মনে করা হয় ; অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও অনুরূপ প্রাণের অভিপ্রকাশ আরো অনেক প্রাণময় জগতের থাকতে পারে, এই সম্ভাবনা তো স্রষ্টা ঈশ্বরের মহিমাই ব্যক্ত করে।

সেদিন কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস ভেঙ্গে পড়বে এই আশঙ্কায় গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ আক্রমণ হয়েছিল। অবিশ্বাস, পরিহাস, অখ্যাতিকর বিবৃতি, শেষ পর্যন্ত কোপার্নিকাসের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি। প্রতিপক্ষ বলে : "কোপার্নিকাসের যুক্তি সমগ্রভাবে সৌরজগতের গতিবিধির আঙ্কিক প্রকাশের সহায়ক মাত্র ; পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণ করে এ কথা স্বীকার করা যায় না।" তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোপার্নিকাসের *De Revolutionibus Orbium Coelestium* গ্রন্থের একটি উক্তির প্রতি "এই গ্রন্থের প্রকল্পগুলি সত্য, এমন নাও হতে পারে। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলে, এমন কোনো গণনা যদি সম্ভব হয় তবেই যথেষ্ট। আমরা নিঃসন্দেহে এগুলোকে পুরনো অন্যান্য অবাস্তব প্রকল্পের পর্যায়ে ফেলতে পারি।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গ্রন্থটির মুদ্রনকালে কোপার্নিকাসের অজ্ঞাতসারে তাঁর বন্ধু ওসিয়ান্ডার লুথারপন্থীরা বিক্ষুব্ধ হবে আশঙ্কা করে ভূমিকায় এই জাতীয় উক্তি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাছাড়া কোপার্নিকাসের প্রস্তাবিত নামের সঙ্গে Orbium Coelestium শব্দ দুইটির সংযোজনও ওসিয়ান্ডারের কীর্তি। তাঁর এই চাতুরীর উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র গ্রন্থটি টলেমীর অনুকরণে লেখা নির্দোষ রচনা, এমনি ধারণার সৃষ্টি করা। গ্রন্থের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে প্রচ্ছন্ন রাখার এই প্রয়াস সার্থক হয়েছিল।

কেপ্‌লার প্রাগে প্রকাশিত *Siderius Nuntius*-এর পুনর্মুদ্রণের ভূমিকায় গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে উচ্চারিত সব আপত্তি খণ্ডন করেন। গ্যালিলিও নিজে বিরুদ্ধবাদীদের উত্তরে এবং কোপার্নিকাস মতবাদের সমর্থনে ছটি পত্র প্রকাশ করেন (Istoris e Dimostrazioni intorno alle Macchie Solari).

সে সময় ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্ররূপে ফ্লোরেন্স পরিচিত। সেখানকার অ্যাকাডেমীর সদস্য হয়ে গ্যালিলিও ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে আসেন কসিমো দি মেদিচির চেষ্টায়। অ্যাকাডেমীতে প্রদত্ত বক্তৃতায় গ্যালিলিও কোপার্নিকাস-মতবাদ দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেন। তিনি অ্যারিস্টটলবাদীদের বলেন, "যেখানে অ্যারিস্টটল ছিলেন চক্ষুকর্ণের অধিকারী এক মানুষ, সেখানে গ্যালিলিওর রয়েছে অতিরিক্ত এক দূরবীক্ষণ।" তিনি আরো বলেন যে তাঁর মতবাদ অশাস্ত্রীয় নয় ; কারণ প্রকৃতির যে নিয়ম অনিবার্য, তা ঈশ্বরের সৃষ্টি।

যুক্তিতর্কে পরাস্ত ও ক্ষুব্ধ টলেমীপন্থী জ্যোতির্বিদগণ সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদে গ্যালিলিওর অধার্মিক আনুগত্যের প্রতি পোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পোপ পঞ্চম পলের আহ্বানে রোমে গিয়ে গ্যালিলিও তাঁর জ্যোতিষীয় ধারণা ও

আবিষ্কারের কুশলী ব্যাখ্যায় প্রতিপক্ষের চক্রান্ত ব্যর্থ করেন। পোপের খাস দরবারে অর্জিত এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যে, উপরন্তু কার্ডিনাল বার্বেরিনোর সৌহৃদ্যে গ্যালিলিওর মনে একটা স্বস্তিবোধ জাগে। তিনি গ্রাণ্ড ডাচেস ক্রিষ্টিন্ ও বন্ধু ক্যাস্তেল্লিকে লেখেন যে শাস্ত্রীয় উক্তির সঙ্গে সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের সঙ্গতিসাধন করা সম্ভব। এই চিঠি দুইটিকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় সমাজ ও স্বার্থান্বেষীরা গ্যালিলিও-নিগ্রহের যে ষড়যন্ত্র করে তার অন্যতম নায়ক পিসার আর্চবিশপ। পোপের নির্দেশে গ্যালিলিও ইনকুইজিশনের সামনে উপস্থিত হন ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্ববিদ্ বেলার্মিন্ শপথ করান শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে দিয়ে তিনি যেন কথায় বা লেখায় সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদ মনন, সমর্থন বা প্রচার না করেন। এর পক্ষকাল পরে পোপ সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের সমর্থক সর্ববিধ প্রয়াস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশের পর এই মতবাদে ধর্মসংস্থার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নি; অসহিষ্ণু হয়ে এ রকম বিধিনিষেধ প্রয়োগ করে নি (কোপার্নিকাসের মতবাদে বিশ্বাসী হওয়াই ব্রুনোর একমাত্র অপরাধ ছিল না)। ধর্মসংস্থা উদার ছিল, অন্তত কোপার্নিকাসের মতবাদ সম্পর্কে, এ রকম ধারণা করা ঠিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদ যে ভাবে উপস্থাপিত করা হয় তাতে টলেমীপন্থী জ্যোতির্বিদ ও ধর্মসংস্থা বিপন্ন বোধ করে নি। এ-প্রসঙ্গে *De Revolutionibus* গ্রন্থের প্রকাশে ওসিয়ান্ডারের ভূমিকা কতটা দায়ী তা উল্লেখ করা হয়েছে। শাণিত যুক্তিতর্ক ও সংশয়াতীত প্রমাণের অভাবে কোপার্নিকাসের মতবাদ বরং বিমূর্ত, দুর্বোধ্য ও অগ্রাহ্য মনে হয়েছিল।

ধর্মসংস্থার সতর্কবাণীতে গ্যালিলিও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তা হলে ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে *Il Saggiatore* প্রকাশ করবার মতো দুঃসাহস তাঁর হত না। অবশ্য প্রায় একই সময় কার্ডিনাল বার্বেরিনো পোপের পদে অভিষিক্ত হন। তাঁর সৌহৃদ্যের কথা স্মরণ করেই গ্যালিলিও নির্ভয়ে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন *Dialogue on the Two Chief Systems of the World.* কোপার্নিকাসের মতবাদকে উপজীব্য করে একটা মনোজ্ঞ বিজ্ঞান-দার্শনিক আলোচনা, সম্ভবতঃ ইয়োরোপে প্রকাশিত প্রথম লোকরঞ্জক বিজ্ঞান-সাহিত্য। স্যালভিয়াতি (কোপার্নিকান জ্যোতিষে বিশ্বাসী), সাগ্রেদো (নিরপেক্ষ) এবং সিম্প্লিসিয়াস (অ্যারিস্টটল-টলেমীর সমর্থক), এই তিন

চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে গ্যালিলিও কী প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন তা সহজেই অনুমেয়। ল্যাটিনের পরিবর্তে ইতালীয় ভাষায় লেখা এই রচনায় তিনি কেপলারের গাণিতিক যুক্তির অবতারণা না করে সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদের দার্শনিকসুলভ বর্ণনা দেন। এই গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সূর্যকেন্দ্রীয় ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং গণিত-অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের কাছে, পৃথিবীই মহাবিশ্বের মধ্যমণি—অ্যারিস্টটল-টলেমীর এই ভূকেন্দ্রীয় ধারণার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করা। উপবৃত্তের পরিবর্তে নিখুঁত বৃত্তপথে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যপ্রদক্ষিণ করে, এরকম ত্রুটি সত্ত্বেও যুক্তিবিন্যাসের নৈপুণ্যে গ্যালিলিওর উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

বিশ্ব পরিকল্পনায় পৃথিবী ও সূর্যের আপেক্ষিক মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা ছাড়াও *Dialogue* গ্রন্থের একটা গভীরতর দার্শনিক বক্তব্য ছিল। বস্তুজগতের আপাত-সম্পর্কহীন ঘটনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ঐক্যের কথা গ্যালিলিও উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেন। অ্যারিস্টটলীয় দর্শন অনুসারে, পৃথিবীর বুকে আর অপার্থিব জ্যোতিষ্কলোকের স্বর্গীয় পরিবেশে যা ঘটছে তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই; একই নিয়মে তারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। 'পার্থিব' আর 'স্বর্গীয়' পদার্থবিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক মধ্যযুগীয় দর্শনের একটা বিশিষ্ট পরিচ্ছেদ। এই বিতর্ক কয়েক শতাব্দী ধরে চলেছিল। 'পার্থিব' আর 'স্বর্গীয়' এই বিভেদ-কল্পনায় সম্ভবতঃ ব্রুনোর আগে আর কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেনি। 'স্বর্গীয়' পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে কোনো আলোচনা না করলেও যে বল ও গতিবিজ্ঞানের নিয়ম পার্থিব ঘটনার ব্যাখ্যায় খাটে তা জ্যোতিষ্কলোকেও সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, গ্যালিলিও এ সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন।

কথোপকথনের ছদ্মাবরণ ভেদ করে গ্যালিলিও-বিদ্বেষীরা *Dialogue* গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি পোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেরী করেনি। রোমের ইনকুইজিশন পূর্বেকার সতর্কবাণী উপেক্ষা করার অভিযোগে গ্যালিলিওর বিচার করে। গ্যালিলিও অপরাধ স্বীকার করেন। ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে নিশ্চয়ই মার্জনা মিলত না, হয়তো বা ব্রুনোর মতোই চরম শাস্তি পেতেন। সত্তর বছর বয়সের ক্ষীণদৃষ্টি বার্ধক্যে ঔদ্ধত্য থাকে না, থাকে ধর্মের প্রতি আনুগত্য। গ্যালিলিওর ধর্মবিশ্বাস ছিল গভীর। তিনি ধর্মসংস্থাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করতে চান নি, যদিও বিজ্ঞানের উপর আরোপিত ধর্মশাস্ত্রের

বিধিনিষেধ সম্পর্কে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল।* স্বীয় মতবাদ প্রত্যাহার করার এবং সদাচরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে তদুপরি কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির মধ্যস্থতায় আজীবন কারাবাসের লঘুদণ্ড হল গ্যালিলিওর। অনেকে মনে করেন, পৃথিবীর আহ্নিক গতির সমর্থনে অকাট্য চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারলে ইনকুইজিশনের দণ্ড লঘুতর হত। এমন প্রমাণ ছিল চোখের সামনে, পিসা ক্যাথিড্রালের দোদুল্যমান দীপাধার। উনবিংশ শতাব্দীতে পারী প্যান্থিয়নের দোলকে ফুকো আহ্নিক গতির প্রমাণ পেয়েছিলেন। ইনকুইজিশনের সতর্ক প্রহরায় আর ক্ষীয়মান দৃষ্টি নিয়ে গ্যালিলিও জীবনের প্রান্তিক নয় বছর অতিবাহিত করেন। এই সময় দেকার্ত আর মিলটনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। অনেক শিল্পী সাহিত্যিককে অনুপ্রাণিত করেছিল এই স্মরণীয় সাক্ষাৎকার। গ্যালিলিওর মৃত্যুর ষোল বছর পরে মিলটন *Paradise Lost* লিখতে শুরু করেন, ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রচনা সম্পূর্ণ হয়। এই গ্রন্থের বিশ্বতত্ত্ব টলেমীয়, কিন্তু মিল্‌টনের মনে অনেক বছর আগের দেখা কোপার্নিকাসবাদী গ্যালিলিওর স্মৃতি সজীব ছিল। অনুবাদের ব্যর্থতার আশংকায় মূল থেকে উদ্ধৃত করা হল :

the moon, whose orb
Through optic glass the Tuscan artist views
At evening, from the top of Fesole,
Or in Valdarno, to descry new Lands,
Rivers, or mountains, in her spotty globe.

বলবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণা

কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় বিশ্বপরিকল্পনা সমর্থন করার জন্য ধর্মসংস্থার সঙ্গে যে বিরোধের সৃষ্টি হয় তার নাটকীয়তা এবং শেষ জীবনের ট্রাজেডি গ্যালিলিওর জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণাকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠা অহেতুক অপাত্রে বর্ষিত এমন কথা বলছি না। কিন্তু এ গবেষণার

* Reasons are doubtless at hand for the rejection of any established religious formula, but it would be perverting the historical record to ascribe the disire to do so to Galileo or to men of science in general.—Singer.

সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ইতিহাস মনকে এত বেশি আলোড়িত করে যে বলবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণায় গ্যালিলিওর যে মহত্তর প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে, তা সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় না। এ-প্রসঙ্গে লাগ্রাঁজ লিখেছেন, "বৃহস্পতির উপগ্রহ শুক্রকলা, সৌরকলঙ্ক ইত্যাদি আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন ছিল দূরবীক্ষণের আর প্রগাঢ় অভিনিবেশের। কিন্তু চোখের সামনে প্রতিনিয়ত যা ঘটছে এবং যার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দার্শনিকগণ বারবার ব্যর্থ হয়েছেন তার মধ্যে নিহিত প্রকৃতির নিয়ম উদ্‌ঘাটন করতে অনন্যসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন।"

লিওনার্দো ও গ্যালিলিওর আরো অনেক পূর্বসূরী পড়ন্ত বস্তুর ক্রমবর্ধমান গতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। কী মাত্রায় এবং কী নিয়মে বস্তু ত্বরিত হয় গ্যালিলিও তা নির্ণয় করেন। সেই সঙ্গে তিনি গতিবেগ সময়ের আনুপাতিক এই অনুমানের ভিত্তিতে সময় ও অতিক্রান্ত দূরত্বের মধ্যে আঙ্কিক সম্পর্ক স্থির করেন। নির্ভুলভাবে বস্তুর দ্রুত পতনের সময় নির্ণয় করা কঠিন ছিল বলে নত সমতলের উপর অনুরূপ পরীক্ষা করা হয়। সেখানে বস্তুর বেগ মন্দীভূত হওয়ায় জলঘড়ির সাহায্যে সময় নিরূপণ সম্ভব হয়েছিল। এই পরীক্ষায় উল্লিখিত আঙ্কিক সম্পর্কের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এ সম্পর্ক থেকেই ত্বরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার উদ্‌ভব। গ্যালিলিও বল সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণার পরিবর্তন করেন। তিনি বলেন, বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল ত্বরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, বেগের সঙ্গে নয়। যে বস্তুর উপর কোনো বল কাজ করছে না তার কোনো অবস্থান্তর ঘটবে না। বস্তুর এই জড়বাদ বা principle of inertia সম্পর্কে গ্যালিলিও বিশদভাবে আলোচনা করেন নি। কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও মন্তব্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বস্তুর গতি সম্পর্কে গ্যালিলিওর এই ধারণাগুলি দেকার্ত ও হাইজেন্‌সের মানসজগতে লালিত হয়। তারপর ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নিউটনের *Principia* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ তিনটি সূত্রের মধ্যে সেগুলি পূর্ণতা লাভ করে।

তরুণ বয়সে দোলকের গতি ও বস্তুর পতন সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের মধ্যে গ্যালিলিওর বিজ্ঞান-প্রয়াসের সূচনা। এই সূচনাপর্বেই অ্যারিস্টটলীয় বলবিদ্যায় তাঁর সন্দেহ জাগে। এমনি সন্দেহ জেগেছিল লিওনার্দো দ্য ভিন্‌চির। কিন্তু গ্যালিলিওর স্বকীয়তার প্রকাশ যথাসম্ভব সুষ্ঠু পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের সাহায্যে স্বীয় মতের সমর্থনে প্রমাণ সংগ্রহের মধ্যে। তিনি পরীক্ষার সঙ্গে একটা

সহজ অথচ কার্যকরী আঙ্কিক পদ্ধতির সমন্বয় করেছিলেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিতর্কে এ ছিল বড়ো হাতিয়ার। তিনি অ্যারিস্টটলীয় পদার্থবিজ্ঞানকে বিচার-বিশ্লেষণ করে তার মূল সূত্রগুলিতে পৌঁছে তাদের গাণিতিক আলোচনার চেষ্টা করতেন। এমনিভাবে তিনি বহুবার স্বীকৃত ধারণার অলীকতা এবং স্বীয় মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রসঙ্গত বস্তুর পতন-সম্পর্কিত পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য। এর ফলে ভারী বস্তুর পতন হাল্কা বস্তুর তুলনায় দ্রুততর, এই অ্যারিস্টটলীয় ধারণা ধূলিসাৎ হয়। গ্যালিলিও লক্ষ্য করেন, কোনো নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে ছেড়ে দেওয়া বিভিন্ন ওজনের দুটি বস্তুখণ্ডের পতনকাল প্রায় সমান। সামান্য যা তফাৎ তার উৎস বাতাসের বাধা। পিসার হেলানো মিনার থেকে গ্যালিলিও আলোচ্য পরীক্ষা সম্পাদন করেছিলেন বলে যে কাহিনী প্রচলিত তা হয়তো অমূলক। অনেকের মতে, সাইমন স্টেভিন গ্যালিলিওর আগে অনুরূপ পরীক্ষা করেছিলেন। এ মতানৈক্যে গ্যালিলিওর কৃতিত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। বিভিন্ন বস্তুখণ্ডের পতনকালের মধ্যে যে সামান্য বৈষম্য তার জন্য পতনমাধ্যমের বাধাই যে দায়ী গ্যালিলিওর এই ধারণা সমর্থিত হয় জলের মধ্যে অনুরূপ পরীক্ষায়। এ থেকে যে অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় তা হল, এমন কোনো মাধ্যম যদি থাকে যা বস্তুর পতন রোধ করবে না, তবে নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে নিক্ষিপ্ত পাখীর পালক ও সীসকখণ্ড একই সঙ্গে ভূমি স্পর্শ করবে। গ্যালিলিওর এই কাল্পনিক মাধ্যম হল সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য পরিবেশ। দুর্ভাগ্যবশত 'বায়ুশূন্যতার বিভীষিকা' (horror vacui) সম্পর্কে তৎকালীন কুসংস্কারের প্রতিকূলে এ সম্পর্কে বহুদিন কোনো পরীক্ষা হয় নি। টরিচেলি কর্তৃক শূন্যতাসৃষ্টির পর গ্যালিলিওর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়।

জীবনের প্রান্তিক দিনগুলিতেও গ্যালিলিও গতিবিজ্ঞানের চর্চায় মনোনিবেশ করেন। প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ প্রকাশে বাধা থাকায় গোপনে পাণ্ডুলিপি ইতালীর বাইরে নিয়ে আসেন প্রিন্স মাতিয়া দি মেদিচি। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লাইডেন থেকে যখন গ্যালিলিওর সারা জীবনের পরিণত বিজ্ঞানচিন্তা প্রকাশিত হয় তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত। *Mathematical Discourses and Demonstrations Concerning Two New Sciences* (Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno a due nuove Scienze) গ্রন্থের রচনাশৈলী *Dialogue*-এর মতো। স্যালভিয়াতি, সাগ্রেদো এবং

সিমপ্লিসিয়াসের কথোপকথনের মাধ্যমে বস্তুর গতি ও বলবিদ্যা সম্পর্কিত বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

নিউটনীয় সূত্রের উপকরণ

Discourses-এর পাণ্ডুলিপি শেষ হলে বল ও গতির পারস্পরিক নির্ভরতা সম্পর্কে গ্যালিলিও যে গবেষণা শুরু করেছিলেন তা অসমাপ্ত রয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর পরিপূরক হিসেবেই যেন নিউটনের জন্ম ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে। সপ্তদশ শতকের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিপ্লব দিক পরিবর্তনের মুখে। গ্যালিলিও কেপলারের পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-প্রকল্প তখনো স্বীকৃতিসাপেক্ষ; দেকার্ত, বয়েল হাইজেন্স্ সনাতন চিন্তাধারাকে তেমন প্রভাবিত করতে পারেন নি। গ্যালিলিওর অনেক অসম্পূর্ণ চিন্তার উপকরণ নিউটনের *Principia*-কে সমৃদ্ধ করেছে; তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছি আগে। যদি সবকিছু বাহ্যিক বাধা দূর করা যায় তবে অনুভূমিক তলে নিক্ষিপ্ত বস্তু অনন্তকাল ধরে গতিশীল থাকবে—গ্যালিলিওর এই ধারণা নিউটনের প্রথম সূত্রের সমার্থক। কোন বস্তুর উপর একই সঙ্গে একাধিক বল প্রযুক্ত হতে পারে কিনা এবং হলে সেই বস্তুর গতিপথ কীরকম হবে সে সম্পর্কে গ্যালিলিও *Discourses* গ্রন্থে আলোচনা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন অভিকর্ষ আর অনুভূমিক নিক্ষেপ এই দ্বিমুখী বলের মিলিত প্রভাবে বস্তুর গতিপথ হবে অধিবৃত্তের মতো। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের সঙ্গে ইহা জড়িত। গ্যালিলিওর বিজ্ঞানকর্মের মধ্যে নিউটনীয় সূত্রের এমনি অনেক উপকরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। গ্যালিলিও সনাতন রক্ষণশীল বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে বিচ্ছেদের সূচনা করেন, আর সে বিচ্ছেদকে সম্পূর্ণ করেন নিউটন, গ্যালিলিও আর কেপলারের বিজ্ঞানকর্মের সংশ্লেষণে। প্রাক্-রেনেসাঁস যুগ আর সপ্তদশ শতাব্দীর চিন্তাজগৎ এত দূরবর্তী যে, অ্যারিস্টটল ও প্লেটো যদিও বা রেনেসাঁস আমলের ইতালীয় চিন্তাধারার মর্মগ্রহণ করতে পারতেন গ্যালিলিও ও নিউটনের ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম করা এই দুই প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকের পক্ষে বোধহয় সহজ হত না।

ভৌতবিষয়ক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কী প্রাসঙ্গিক ও গ্রাহ্য আর কী বর্জনীয় এ নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ছিল। ভর, দৈর্ঘ্য ও গতির এইসব প্রাথমিক ভৌতগুণের সঙ্গে রূপ রস গন্ধ স্পর্শের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কল্পনার ফলে যে

বিশৃঙ্খল ধারণার উদ্‌ভব হয়েছিল গ্যালিলিও সেগুলি সংহত করেন। তিনি *Il Saggiatore* গ্রন্থে বলেছেন :

"যখনি কোনো ভৌত বা দেহগত বস্তুর কথা ভাবি, সঙ্গে সঙ্গে এটাও ধারণা করার প্রয়োজন উপলব্ধি করি যে তার একটা সীমারেখা এবং অবয়ব আছে; কোন বিশেষ মুহূর্তে তা কোনো বিশেষ স্থানে অবস্থিত তা চলমান বা স্থির তা অন্য কোনো বস্তুকে স্পর্শ করে রয়েছে বা নেই এবং তা সংখ্যায় এক বা একাধিক। এ অবস্থা থেকে বিযুক্ত কোনো বস্তু আমার কল্পনায় আসে না। কিন্তু তা সাদা কি লাল, তেতো না মিষ্টি, মুখর না মূক, এসব বিষয়কে পদার্থের অবশ্য অনুষঙ্গ হিসেবে মনে করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।" বস্তুর গুণকে পরিমেয় এবং অপরিমেয় বলে তিনি বিশেষিত করেন। গ্যালিলিওর এই ধারণা সে যুগে নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান-প্রগতির মূল্যবান সহায়ক হয়েছিল। তদুপরি এই ধারণা উত্তরকালের দার্শনিক চিন্তাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। উল্লেখযোগ্য, গ্যালিলিও যে-সব গুণ অপরিমেয়, গৌন বলে মনে করতেন, হয়তো আজ আর তা বিজ্ঞানীর কাছে উপেক্ষণীয় নয়, অন্তত বস্তুর রং। সীমারেখা একদিন সম্পূর্ণ লুপ্ত হতে পারে।

Siderius Nuntius গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণের মধ্যে তার আধুনিক যুগসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রেক্ষিত বস্তু সম্পর্কে নীতিবাগীশ ও ভাববিলাসী নন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চাঁদ সম্বন্ধে কোনো প্রশস্তি বা জ্যোতিষ্ক হিসেবে তার স্বর্গীয়তা ও আলোর পবিত্রতাকে সমান্তরাল কল্পনা করবার উচ্ছ্বাস নেই। তার বদলে আছে পর্যবেক্ষণকে নির্ভরযোগ্যভাবে লিপিবদ্ধ করার সযত্ন প্রয়াস, যা তিনি দেখেছেন তার বাস্তব বর্ণনা। লেখার স্টাইল ও বক্তব্য-বিষয়ের অবতারণা ও উপস্থাপনার ভঙ্গি আধুনিক, তার রচনাকাল যে সাড়ে তিনশ বছর পিছনে কখনো তা মনে হয় না। বৈজ্ঞানিক সত্যে পৌছনোর জন্য আরোহী যুক্তিধারার প্রয়োগ *Sidereus Nuntius* গ্রন্থে সুস্পষ্ট। বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণরত উপগ্রহ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসেন গ্রহের সঙ্গে তার উপগ্রহের অচ্ছেদ্য আকর্ষণ সম্পর্কে অর্থাৎ গ্রহ তার অনুগত উপগ্রহকে নিয়েই সূর্য প্রদক্ষিণ করে। আরোহী যুক্তিধারা গ্যালিলিওর উদ্‌ভাবন নয়। কিন্তু যুক্তিধারার স্বচ্ছতা এবং সেই পথে তিনি যে সব তথ্য সংগ্রহ করেন তা বিজ্ঞানচিন্তার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক।

গ্যালিলিও নব্যবিজ্ঞান যুগের উদ্‌বোধন করেন। তার সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল রেনেসাঁস আমলে। একমাত্র সনাতন চিন্তাধারার সঙ্গে বিচ্ছেদের মধ্যেই আধুনিক বিজ্ঞান যুগের উদ্‌বোধন হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে। দুর্ভাগ্যবশত এই বিচ্ছেদকে ত্বরান্বিত না করে অ্যারিস্টটলীয় মতবাদে দীক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ রেনেসাঁস যুগের মানবিকতা ও বিজ্ঞানচিন্তার বিরোধিতা করে। যে ধর্মীয় মঠ এককালে শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, ছিল জ্ঞান প্রগতির সংরক্ষক, সপ্তদশ শতাব্দীতে তার লালন থেকে বিজ্ঞান বঞ্চিত হয়। ধীরে ধীরে মুষ্টিমেয় রাজদরবার আর পণ্ডিতসভা বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠে। সপ্তদশ শতকের বৈজ্ঞানিক তৎপরতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বিজ্ঞান-অ্যাকাডেমী—১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে নেপল্‌স্‌এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (Academia Secretorum Nature). কিন্তু কালো ম্যাজিকের আস্তানা এই সন্দেহে পোপ তা অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ করে দেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে একাধিক বিজ্ঞান-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় তার মূলে গ্যালিলিওর পরোক্ষ প্রভাব ছিল। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে Accademia dei Lincei প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগে ছিলেন প্রিন্স ফেদেরিকো চেসি, গ্যালিলিওর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ফ্লোরেন্সে গ্যালিলিওর শিষ্যবর্গ স্থাপন করেন Accademia del Cemento (১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)। কয়েক বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হয় ইংল্যাণ্ডে রয়াল সোসাইটি (১৬৬০) এবং ফ্রান্সে Académie des Sciences (১৬৬৬), ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয় *Philosophical Transaction, Journal des Scavants, Acta Eruditorum*, ইত্যাদি বিজ্ঞান-পত্রিকা।

ষোড়শ শতকের শেষ অবধি যে প্রাচীন-বিজ্ঞান পণ্ডিত মহলের আদর্শ ও আশ্রয় ছিল তার স্থান অধিকার করে পরীক্ষা। সূক্ষ্ম যন্ত্রের উদ্‌ভাবন, নিপুণ পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ ও গণিত-নির্ভর আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমশ মানুষ সচেতন হয়। চিন্ত ধারার যে রূপান্তরের ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম, তাতে কোপার্নিকাস, ভেসালিয়াস, হার্ভে, টাইকো ব্রাহে, কেপলার এবং আরো অনেকের অবদান রয়েছে। কিন্তু গ্যালিলিওর প্রাধান্য এতো বেশি যে এ বিপ্লবকে গ্যালিলিও নামে বিশেষিত করা অযৌক্তিক নয়। পরিবর্তনটা কী? সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে নতুন তথ্যের সংযোজন? না। তবে কি সৃষ্টি স্থাপত্যের প্রচলিত ধারণাকে বদলানো? তাও নয়। কী ভাবে এবং কী ধরনের জ্ঞান অর্জনীয়, পরিবর্তনটা সে-সম্পর্কে আমাদের

মনোভঙ্গীর। বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত হবার পথে পরীক্ষণ অপরিহার্য বেকনের এই উপলব্ধির প্রথম সার্থক প্রয়োগ গ্যালিলিওর বিজ্ঞানপ্রয়াসের মধ্যে। একান্তভাবে পরীক্ষা-নির্ভর অনুসন্ধানের যে মনোবৃত্তি বিজ্ঞানপ্রগতির মূলে তার জন্য আমরা ঋণী এই ইতালীয় বিজ্ঞানীর কাছে। গ্যালিলিও যদি শুধু দূরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্রসূর্য গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি নির্ণয় করতেন বা কোপার্নিকাসের বিশ্বচিত্রকে ধর্মীয় নিপীড়ন ও সংস্কার বিভ্রূপের প্রতিকূলে প্রতিষ্ঠিত করে যেতেন তাতেই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। কিন্তু, যে-সম্পদ তিনি দিয়ে গিয়েছেন তা নিছক উদ্‌ভাবন ও আবিষ্কারের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। গাণিতিক পদ্ধতি ও ভৌতপরীক্ষার যে উর্বর সমন্বয়ে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ঋদ্ধি গ্যালিলিও গ্যালিলি তাতে পৌরহিত্য করেন।

গ্রন্থপঞ্জী

H. T. Pledge, *Science Since 1500*, New York, 1947

Bertrand Russell, *The Scientific Outlook*, London, 1949.

S. F. Mason, *Main Currents of Scientific Thought*, New York, 1953

A. D. White, *A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom*, New York, 1960

সমরেন্দ্রনাথ সেন, বিজ্ঞানের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৫৮

Charles Singer, *A Short History of Scientific Ideas to 1900*, Oxford, 1959.

তারাস্ শেভচেনকো

(১৮১৪-১৮৬১)

[য়ুক্রেনীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা তারাস্ শেভচেন্‌কো'র প্রতিভা বিকশিত হয় চিত্র, সঙ্গীত ও কবিতা—শিল্পকলার তিনটি প্রধান ক্ষেত্রেই। অথচ তিনি ছিলেন এক ভূমিদাসের সন্তান সেই নির্দয় যুগে, যখন রুশ সম্রাট প্রথম নিকলাই-এর কঠিন শাসনে রুশ দেশের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির কণ্ঠ রুদ্ধ। পরাধীন দেশ য়ুক্রেনের জনগণের তো দুর্দশার সীমা ছিল না। শেভচেন্‌কো'র জন্ম হয় ১৮১৪ সালের ৯ই মার্চ। তাঁহার জীবনের প্রথম চব্বিশ বছর কাটে জমিদার এঙ্গেলহার্ট পরিবারের ভূমিদাস হিসবে, যখন শারীরিক প্রহার ও মানসিক অপমান ছিল তাঁহার নিত্যসাথী। তা সত্ত্বেও শেভচেন্‌কো'র চিত্রাঙ্কণ-প্রতিভা কর্তার চোখে পড়ে ও তিনি এই যুবককে রাজধানী পিটার্সবুর্গে আনেন, যাতে এর শিল্পশক্তি তাঁহার "দরবারের" গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে। এখানে শেভচেন্‌কো বিখ্যাত রুশ শিল্পী কার্ল ব্রুইলড্-এর সংস্পর্শে আসেন, যিনি নিজে একখানি চিত্র আঁকিয়া লটারীতে বিক্রয় করেন ও এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়া শেভচেন্‌কো'র ভূমিদাসত্বের অবসান ঘটান। এই সময়ে শেভচেন্‌কো কবিতা রচনায় মন দেন, যে কবিতা ছিল নির্যাতিত য়ুক্রেনীয়দের মর্মের কাহিনী। ফলে, ভূমিদাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াও শেভচেন্‌কোকে যাইতে হয় নির্বাসনে, জার নিকলাই-এর আদেশে। নির্বাসনে তিনি ছবি আঁকিতে বা কবিতা লিখিতে পাইবেন না—ইহাই ছিল রুশ সম্রাটের স্বহস্ত লিখিত আদেশ। দীর্ঘ নির্যাতনের পর তিনি পূর্ণ মুক্তি পান ১৮৫৭ সালে। আর তাঁহার মৃত্যু হয় ভীষণ ড্রপ্‌সি রোগে ১৮৬১ সালের ১০ই মার্চ তারিখে।

শেভচেন্‌কো জন্মভূমিকে ভালোবাসিতেন জননীর মতো, আর দেশের অত্যাচারী শাসনকর্তাদের তিনি প্রায়ই উল্লেখ করিতেন দুশমন বলিয়া। তাঁহার সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা—"অন্তিম নির্দেশ"। বিশ্বশান্তি সংসদের নির্দেশে এ বৎসর পৃথিবীর নানা দেশে শেভচেন্‌কো'র স্মৃতিতে সম্মান জ্ঞাপন করা হইতেছে। এই উপলক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে এই বিখ্যাত কবিতাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি।]

শেভচেনকো : অন্তিম নির্দেশ

(ৎভারদভস্কি-র রুশ অনুবাদ হইতে)
আমার মরণ হ'লে রেখে দিয়ো এই দেহ
প্রাণপ্রিয় য়ুক্রেনের কোলে,
কবরের তরে মোর বেছে নিয়ো হেন ঠাঁই
চারিপাশে মুক্ত সমতলে,
কফিনেতে শুয়ে শুয়ে আমি যেন পাই কাছে
স্তেপ্-এর অসীম বিস্তার,
দ্নীপারের খাড়া তীর, কানে যেন এসে লাগে
তরঙ্গের স্বনন তাহার।
য়ুক্রেনের ভূমি থেকে অরাতির রক্তলিখা
মুছে দিয়ে দ্নীপারের জল
মিশিবে সাগর-নীলে···য়ুক্রেনের এ কবর
ছেড়ে উঠো তখনই কেবল,
কেবল তখনই আমি প্রার্থনার তরে যাব
বিধির সদনে মোর···তবে
সেদিন না আসে যতদিন···তাঁর সাথে মোর—
কোনরূপ সংযোগ না রবে।
আমাকে প্রোথিত করো, তারপরে ওঠো সব,
ভেঙে ফেলে শৃঙ্খলের ভার,
দুশমনের রক্তধারে করো ত্বরা অভিষিক্ত
নবলব্ধ মুক্তির প্রসার।
তারপরে দেশ-জোড়া নব মহা-পরিবারে,
ভয়মুক্ত মহা-পরিবার ;—
সদয় কথার সাথে কোমল ব্যঞ্জনা দিয়া
মনে কোরো নামটি আমার।

অনুবাদক : নীরেন্দ্রনাথ রায়

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

বৃক্ষের ভাগ্যকে ঈর্ষা করি

বৃক্ষের ভাগ্যকে ঈর্ষা করি।

আপনার ব্যথা থেকে আপনি ফোটায় পুষ্পদল।
আপন কস্তুরীগন্ধে আপনি বিহ্বল।
বিদীর্ণ বল্কলে বাজে বসন্তের বাঁশী বারংবার।
আত্মজ কুসুমগুলি সহস্র চুম্বনচিহ্নে অলঙ্কৃত করে ওষ্ঠতল।

আমি একা ফুটিতে পারি না
আমি একা ফোটাতে পারি না
রক্তের বিষাদ থেকে আরক্তিম একটি কুসুমও।

আমাকে বৃক্ষের ভাগ্য তুমি দিতে পারো।
বহু জন্ম বসন্তের অম্লান মঞ্জরী ফুটে আছো,
নয়নের পথে দীর্ঘ ছায়াময় বনবিথীতল।
ওষ্ঠপুটে প্রস্ফুটিত কুসুমেরা কাকলী মুখর।
আমাকে বৃক্ষের ভাগ্য তুমি দিতে পারো।

তুমি পারো করতলে তুলে নিতে আমার বিষাদ
ভিক্ষাপাত্র ভরে দিতে পারো তুমি কুসুম সম্ভারে।
সর্বাঙ্গ সাজিয়ে আছো উচ্ছ্বসিত সৌরভে শ্যামলে
উদ্গত অশ্রুকে তুমি অভ্যর্থনা করে নিতে পার না কি তোমার উদ্যানে ?

মোহিনীরা স্বভাবে নির্মম।
আর যারা ভালবাসে
তারা শুধু নিজেদের আত্মার ক্রন্দনে ক্লিষ্ট হয়।

বৃক্ষের ভাগ্যকে তাই এত ঈর্ষা করি।
অপরের ভিক্ষালব্ধ ভালবাসা ব্যতীতই তার
প্রণয়ের পুষ্পগন্ধে স্তবকে স্পন্দিত পূর্ণ প্রাণ।

চিত্ত রায়

প্রতীক্ষার দিনগুলি

ঘনীভূত হতে হতে একদিন
কালো কালো মেঘগুলো আমাদের উপর
ঝরতে শুরু করবে।
বড় জোর একোণ থেকে ওকোণে
স্থানচ্যুত হতে পারে, যতটুকু বাতাসের ক্ষমতা।

মানুষ কল্যাণকামী, ভাগ করে' নেবে
প্রতিটি ভগ্ন অংশ।
তৃষ্ণার্ত চাতক হয়তো পাবে জল।

অথচ আকাশে এখনও
আসন্ন ঝড়ের জনয়িত্রী
কালো মেঘ।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

ঘাতক

দারুণ ঘাতক কেউ অবিরল চতুর রীতিতে
আমার পেছনে ঘোরে। মিশে যাই ফুটপাথে : ভিড়ে;
ছুটে গিয়ে ট্রামে উঠি; ফাঁস দিয়ে অলিতে গলিতে,
চারপাশ দেখে-টেখে, সন্তর্পণে ঘরে আসি ফিরে।

দরজায় খিল তুলে দেখি সে আমারই অপেক্ষায়
চেয়ারে রয়েছে বসে—মুখ ঢাকা দৈনিক কাগজে।
"কে, কে, তুমি, হে ঘাতক? বিপন্ন জন্মের ব্যর্থতায়
মঞ্চের বাইরে থাকি। সন্তাপের প্রদাহ মগজে।

কী লাভ আমাকে মেরে? ঝঞ্ঝাহত আমার বাগান,
সেখানে ফোটে না কোনও অনবদ্য স্বপ্নের কোরক।
করে না আমাকে লুব্ধ সমুদ্রের মাতাল আহ্বান—
আমার বুকের মধ্যে মৃত সব পাখির পালক।"

কাগজ ফেলে সে উঠে দাঁড়াল, এবারে মুখ তার
দেখা গেল। আরে, এ যে প্রতিমূর্তি হুবহু আমার॥

অশোক পালিত

প্রদক্ষিণ

অভ্যাসের কক্ষপথে যথাবিধি প্রদক্ষিণ দেখেছি, জেনেছি—
মানুষেরা সত্য থেকে মন তুলে নেয়, প্রাচীন মাটির গন্ধ
মূল্যহীন, উপযোগ হারায় ক্রমশ, দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
শেষ হলে নিরঞ্জন অস্থি হাতে ফিরে আসে গৃহগতপ্রাণ।
কেহ কি বলিতে পারে কোন্ জলে ডুবে গেলে মানব আত্মার
শান্তি হয় পুণ্য হয় সার্থক মানবজন্ম? ত্রিশূলে গাঁথিয়া
নিশান উড়ায় কেন, ভিখারী পয়সা পায়, ব্রজবাসীগণ
স্বার্থে কি পরার্থে ছোটে কুণ্ডে কুণ্ডে স্নান করে কীর্তন বিলায়?

কেহই পারে না তবু বিন্যাস কামনা করে, গোলাপের কাঁটা
বাব্‌লার কাঁটা কিম্বা যাই হোক্ ফুটে ওঠে অবিনাশ হয়
ততক্ষণ যতক্ষণ দীপক জ্বালায় কেহ সেবা দান করে
মৃত্যুকে সম্মুখে রেখে ভালোবাসে, বহুদূর পায়ে হেঁটে আসে।

তবে কি একথা সত্য সকলের অভিলাষ যদি জড়ো হয়
আলো করে দেয়া যায় নির্বিকার প্রদক্ষিণ ঘর ও বাহির?

আবদুল আজীজ আল্‌-আমান

কবি বিদ্রোহী প্রসঙ্গে

'মোসলেম ভারত' যুগের কবি নজরুলের অনেক কথা, অনেক ঘটনার সাক্ষী আফ্‌জালুল হক সাহেব। এই সময় নজরুল দীর্ঘদিন আফজালুল হকের সঙ্গে থেকেছেন, একই অন্ন খেয়েছেন দু-জনে।

নজরুলের পানপ্রিয়তার কথা বর্তমানে একটা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে, অবিশ্বাস্য বলেও অনেকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু বিষয়টা সম্পূর্ণ সত্য। আফজালুল হক সাহেব জানাচ্ছেন পানের 'বাটায়' কোনো কাজ হত না—নজরুলের জন্য ছিল পানের 'ডাবর'। বড় বড় পান একসঙ্গে তিনি পাঁচটা-ছটা পর্যন্ত অবলীলাক্রমে মুখে দিয়ে মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করতেন। মেডিক্যাল কলেজের বিপরীত ফুটপাতে এক পানের দোকান ছিল—একজন বৃদ্ধা পানোয়ালী ছিলেন সে পানের দোকানের মালিক। তাঁর পান সে সময় ও-এলাকায় বিখ্যাত ছিল। পয়সায় দুটি করে পান—বিরাট আয়তনের খিলি। প্রধানত কবির জন্যই প্রতিদিন দশ থেকে বার আনার পান খরচ হত। বুড়ীর পান, পুঁটিরামের দোকানের মিষ্টি এবং মালাইয়ের চা—এ তিনটি ৩২ নম্বরের দ্বিতলের কোণার ঘরটির নিত্য অতিথি ছিল। কেবল নজরুল কেন—অন্য যে কোনো দর্শক বা অতিথি ওখানে গেলে এ তিনটির দর্শন পেতেন। বলাবাহুল্য আফজাল সাহেব হাসিমুখেই সকল খরচ বহন করতেন।

'মোসলেম ভারত'-এর যুগেই কবি এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের 'নবযুগ'-এর সঙ্গে যুক্ত হন—কিন্তু কিছুদিন কাজ করার পর তিনি 'নবযুগ'-এর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই সময় কবির শরীরও ভালো যাচ্ছিল না। বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কিছুদিন বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি দেওঘরে যাবেন। যে কথা সেই কাজ। কবি যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু এদিকে 'মোসলেম ভারত'-এর উপায় যে কী হবে সেটি একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। নজরুল ছাড়া 'মোসলেম ভারত' অচল। এ-প্রসঙ্গে জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ মন্তব্য করেছেন যে,

সে সময় ঠিক হয়েছিল দেওঘরে থাকাকালীন আফজালুল হক প্রতিমাসে একশো করে টাকা পাঠাবেন—আর ওখান থেকেই কবি পত্রিকার জন্য লেখা পাঠাবেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এ মন্তব্য ঠিক নয়। কেননা, জনাব আফজালুল হক জানিয়েছেন যে, সে সময় এ ধরনের কোনো কথা হয়েছিল বলে তাঁর মনে নেই। তাছাড়াও পবিত্রবাবুর নিকট লেখা কবির চিঠি (যা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম) থেকে জানা যায় যে, দেওঘর থেকে কবি সাহায্য হিসেবেই টাকাটা চেয়েছেন—পাওনা বা দাবী হিসেবে নয়। যাহোক দেওঘরে যাবার দিন সাড়ম্বরে একটি বিদায়-সম্বর্ধনা জানানো হল কবিকে। এই অনুষ্ঠানের মূলে আফজালুল হক সাহেব। এই অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে 'সন্দেশ' সম্পাদক সুবিনয় রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মুজফ্‌ফর আহমদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে স্মরণীয়। এই অনুষ্ঠানে কবি তাঁর কয়েকদিন পূর্বে রচিত :

"বন্ধু আমার ! থেকে থেকে কোন্ সুদূরের নিজন পুরে
ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে ?
আমার অনেক দুখের পথের বাসা বারে বারে ঝড়ে উড়ে,
ঘর-ছাড়া তাই বেড়াই ঘুরে।"

গানটি গেয়ে শোনান। আফজালুল হক সাহেব তাঁর স্মৃতি থেকে জানান যে এই অনুষ্ঠানে মোট আটত্রিশ টাকা ছ-আনা খরচ হয়েছিল।

দেওঘরে পৌঁছেই কবি তাঁর অন্যতম বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠি দেন। সেই অপ্রকাশিত চিঠিটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম :

Dr. Bose's Sanatorium
Quarter No. 49
Deoghar.
শুক্রবার, বিকাল
[কোনো তারিখ লেখা ছিল না—ডাকঘরের স্ট্যাম্পের তারিখ 19 Dec, 20.]

ভো ভো "লিভ'র" মুর্শ'য়ের !

গতকাল শুভ দিবা দ্বিপ্রহরে অহম্ দানবের এই দেওঘরেই আসা হয়েছে। আপাততঃ আসন পেতেছি ঐ উপরের ঠিকানাতে। শিমুলতলা যাওয়া হয়নি।

পথের মাঝে মত বদলে গেল। পরে সমস্ত কথা জানাব। জায়গাটা মন্দ নয়। তবে এক মাসের বেশী থাকতে পারব না এখানে, কেননা এখনো (?) খুব বেশি আনন্দ পাচ্ছি না।…নারায়ণের টাকাটা দিয়েছিস অবিনাশদা'কে। যদি হাতে টাকা থাকে, তবে বিজলির দু টাকা তাদের অফিসে দিয়ে আমার ঠিকানায় কাগজ পাঠাতে বলিস।…তোর বৌ-এর খবর কি? তাঁর সঙ্গে আমার চিঠির মারফৎ আলাপ করিয়ে দিস। কালই চিঠি না পেলে কিন্তু তোদের মাঝে জোর কলহ বাধিয়ে দেব।…কান্তিবাবুকে আমার প্রীতি ভালবাসা আর প্রণাম জানাস। তোর গল্প লিখবো, একটু গুছিয়ে নি আগে। বড্ডো শীত রে এ…জায়গায়। টাকা ফুরিয়ে গেছে, আফজল কিম্বা খাঁ যেন শীগ্‌গীর টাকা পাঠায়, খোঁজ নিবি আর বলবি আমার মাঝে মানুষের রক্ত আছে। আজ যদি তারা সাহায্য করে, তা ব্যর্থ হবে না—আমি তা সুদে আসলে পুরে দেবো।

ইতি—

তোর পিরীত-দধি-লুব্ধ মার্জ্জার

নজরু।

সানাটোরিয়ামের পাশে কবি একটি বাসা ভাড়া নেন। এখানে আবদুল নামে একজন ভৃত্য কবির সকল কাজ করে দিত। কিন্তু দেওঘরে এসে কবির সৃষ্টির কিছুমাত্র উন্নতি হল না। উন্নতি তো হলই না—বরং বেশ কিছু অবনতি দেখা গেল। বেশ কয়েক মাসের মধ্যে তিনি মাত্র গুটিকয় গান ছাড়া আর কিছুই লেখেন নি। নজরুলের জীবনধারা ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁর দুঃখের, দারিদ্র্যের দিনগুলিতে তিনি উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। কিন্তু দেওঘরের নিশ্চিন্ত অলস জীবনযাত্রার মধ্যে সে জ্বালা-যন্ত্রণা-দাহন কোথায়?

এই সময়ের একটি ছোট্ট ঘটনা স্মরণীয়। দেওঘরে থাকাকালীন এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। একদিন দুপুরে মধ্যাহ্নের ক্লান্তিকর মুহূর্তগুলি যাপনের জন্য কবি ভদ্রমহিলার বাসায় এসে হাজির হলেন। কিন্তু নিরাশ হতে হল তাঁকে। দেখা গেল দরজায় তালা দেওয়া—বিশেষ প্রয়োজনে ভদ্রমহিলা ছেলেমেয়েদের নিয়ে অন্য কোথাও গেছেন। কবি একখণ্ড কাঠকয়লা দিয়ে বড় করে দেওয়ালে লিখে দিলেন :

"আজ দুপুরে দেওঘরে,
কেউ ঘরে নেই কেউ ঘরে।"

জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ গিয়ে কবিকে দেওঘর থেকে কলকাতায় আনেন।

আফজালুল হক সাহেবের নিকট হতে আর একটি মূল্যবান তথ্য জানা গেছে। এ তথ্যটি দিয়ে আমাদের অনেকের ভুল সংশোধিত হবে।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত বই কোনটি? যুগবাণী? অগ্নিবীণা? না ব্যথার দান?

আজ পর্যন্ত সকল নজরুল-জীবনীকার—এমন কী নজরুল-জীবনী সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ পর্যন্তও—লিখেছেন যে নজরুলের প্রথম প্রকাশিত বই 'যুগবাণী' এবং দ্বিতীয় বই 'অগ্নিবীণা'। কিন্তু তথ্যটি আদৌ সত্য নয়। সন্দেহাতীতরূপে নজরুলের প্রথম প্রকাশিত বই 'ব্যথার দান'। প্রমাণস্বরূপ একটি মাত্র ঘটনাই যথেষ্ট।

'মোসলেম ভারত'-এর যে সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩২৮) "বিদ্রোহী" কবিতাটি প্রকাশিত হয় সেই সংখ্যায় 'ব্যথার দান'-এর বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছে। 'ব্যথার দান' এই বিজ্ঞাপনের পূর্বেই বাজারে প্রকাশিত হয়েছে। 'অগ্নিবীণা'র প্রধান কবিতাই "বিদ্রোহী"—সুতরাং 'অগ্নিবীণা' 'ব্যথার দান'-এর পূর্বে প্রকাশিত হতে পারে না। তাছাড়া 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' রক্ষিত 'ধূমকেতু'র পুরাতন ফাইল দেখলেও বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত হবে। 'ধূমকেতু'-র প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় (শনিবার, ১৬ই ভাদ্র, ১৩২৯ সাল মোতাবেক মোহর্‌রম, ১৩৪১ হিজরী) হতে কয়েকটি সংখ্যা পরিষদে আছে। ঐ সপ্তম সংখ্যায় 'অগ্নিবীণা' ও 'যুগবাণী' মুদ্রিত হচ্ছে বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে—কিন্তু ঐ সংখ্যার কভারে 'ব্যথার দান' পুস্তক সম্পর্কে অন্যান্য সংবাদপত্রিকার সুদীর্ঘ মতামত মুদ্রিত করা হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় 'ব্যথার দান' কবির প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। এরপর মুদ্রিত হয় 'অগ্নিবীণা'—সুতরাং 'অগ্নিবীণা' কবির দ্বিতীয় বই, তৃতীয় বই হল 'যুগবাণী'।

'ব্যথার দান' প্রকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। "হেনা", "ব্যথার দান", "অতৃপ্ত কামনা" প্রভৃতি গল্পগুলি ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হতেই কবি ঐ লেখাগুলির পাণ্ডুলিপি নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন প্রকাশকের নিকট কয়েকদিন ধরে যাতায়াত করেন। টাকার বিশেষ প্রয়োজন অথচ 'ব্যথার দান' প্রকাশে কেউ সম্মত নন।

যে কালে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো বইয়ের প্রথম সংস্করণ দপ্তরীর বাড়িতে নষ্ট হয়—সে সময় একজন নূতন লেখকের বই ছাপতে যাওয়া অনেকখানি বিপদের কথা বৈকি! এবং এ বিপদের সম্ভাবনা সকল প্রকাশক সজ্ঞানে এড়িয়ে গেলেন। একদিন দুপুরে ঘোরাঘুরির পর যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে কবি বাসায় ফিরেছেন, আফজালুল হক বসে আছেন সেখানে। কবি 'ব্রিচেস' (সৈনিক পোশাক) খুলছেন এমন সময় হক সাহেব "কোথায় গিয়েছিলেন" জিজ্ঞেস করতেই কবি 'ব্যথার দান' সম্পর্কে সকল কথা বলে গেলেন। তাঁকে যথেষ্ট ম্লান এবং বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। সেই মুহূর্তেই কোনো কিছু বিবেচনা না করে আফজালুল হক 'ব্যথার দান' ছাপতে রাজী হলেন। কবির পক্ষে তো সেই মুহূর্তে কোনো কিছু বিবেচনা করা সম্ভব ছিল না (আর তিনি কোন দিনই বা তা করেছেন), তিনি সঙ্গে সঙ্গে 'কপি রাইট' লিখে দিলেন। আফজালুল হকের সঙ্গে তখন তাঁর যা সম্পর্ক সে অবস্থায় মূল্যের কথা উঠতেই পারে না। 'কপি রাইট' লিখে দেওয়ার জন্যে হকসাহেব কোনোরূপ জোর বা চাপ দেন নি। কবি স্ব-ইচ্ছায় এবং আনন্দের সঙ্গে দুশো টাকার বিনিময়ে 'কপি রাইট' লিখে দেন।

যথাসময়ে 'ব্যথার দানে'-এর পাণ্ডুলিপি প্রেসে পাঠানো হল। কিন্তু পাইকা টাইপে গল্পগুলি মুদ্রণের পর দেখা গেল মাত্র ষাট পৃষ্ঠার বই হয়েছে। ঐ অবস্থায় একটি চটি বই বাজারে বার করা যায় না—কবিও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন শ্রাবণ মাস, মধ্যাহ্ন কাল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির অবিশ্রাম বর্ষণ, বাদলের সকল চিহ্ন সুস্পষ্ট। সেই মেঘাচ্ছন্ন বাদল-মধ্যাহ্নেই কবি লিখতে বসে গেলেন—প্রায় দু ঘণ্টার কাছাকাছি সময়ে লিখে ফেললেন সুদীর্ঘ গল্প "বাদল-বরিষণে"। গল্পটি শ্রাবণ মাসের (১৩২৭ সাল) 'মোসলেম ভারত'-এ মুদ্রিত হয়েছিল। 'রাজবন্দীর চিঠি' তিনি এর পরে রচনা করেছিলেন। এবং ঐ দীর্ঘ গল্পদুটি নিয়ে মোটামুটি একটা গ্রন্থ আকারে 'ব্যথার দান' বাইরে আত্মপ্রকাশ করে।

'মোসলেম ভারত'-এর প্রকাশ তখন খুব অনিয়মিত। কবি আফজালুল হক সাহেবকে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের কথা জানালেন—এ থেকে অর্থাগম হলে 'মোসলেম ভারত'কে আবার প্রকাশ করা যাবে। বলাবাহুল্য হক সাহেব রাজি হয়ে গেলেন। হক সাহেবের নামেই চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট হতে মুদ্রাকর ও প্রকাশক ডিক্লারেশন নেওয়া

হল। কাগজের সারথি হলেন কাজী নজরুল ইসলাম, ম্যানেজার হিসেবে ছাপা হল শ্রীশান্তিপ্রসাদ সিংহের নাম। প্রথম সংখ্যা যেদিন আত্মপ্রকাশ করে সেদিনের রাতটি এক অবিস্মরণীয় রাত। হক সাহেবের মুখে জানা গেল, কবির সে কী আনন্দ, সে কী উন্মাদনা। কবির সঙ্গে হক সাহেবও সারা রাত মেটকাফ প্রেসে জেগে কাটিয়ে দিলেন। আর জাগলেন প্রেসের কর্মীবৃন্দ। কবি ও হক সাহেব মাঝে মাঝে প্রুফ দেখেন, প্রুফ না থাকলে গান গেয়ে প্রেসের কর্মীবৃন্দের আনন্দ দেন, হৈ-হুল্লোড় করে কম্পোজিটারদের নিদ্রা থেকে দূরে রাখেন, মাঝে মাঝে চা আর পান তো আছেই। সে রাতে মেটকাফ প্রেসের মধ্যে একটা আনন্দ ও উন্মাদনার ঝড় বয়ে গেল।

সকালে বাইরে আত্মপ্রকাশ করল 'ধূমকেতু'!

'ধূমকেতু'র প্রথম হকার হল আবদুল। এই আবদুল দেওঘরে থাকার সময় কবির সকল কাজ করে দিত। দেওঘর থেকে কলকাতায় আসার সময় কবি একে সঙ্গে করে আনেন এবং আফজালুল হক একে কবির সেবার জন্য নিযুক্ত করেন। সে সকালবেলাই এক বাণ্ডিল 'ধূমকেতু' নিয়ে হাওড়ার দিকে চলে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব কাগজ বিক্রি করে দেহমনে উন্মত্ত নেশা নিয়ে ছুটে এল আবদুল, আরো কাগজ চাই। কিন্তু তখন সব শেষ, বিক্রির জন্যে আর একটি কপিও অবশিষ্ট নেই।

প্রথম বর্ষের অষ্টম সংখ্যা (মঙ্গলবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৩২৯ সাল মোতাবেক ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত 'ধূমকেতু' আফজালুল হকের বাসা ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীট হতে প্রকাশিত হয়—তারপর পত্রিকা-অফিস ৭নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেন-এ উঠে যায়। অষ্টম সংখ্যা 'ধূমকেতু'তে এই অফিস পরিবর্তনের ঘোষণা এই ভাবে মুদ্রিত হয়েছে :

"'ধূমকেতু'-র কেন্দ্রচ্যুতি—
'ধূমকেতু' কেন্দ্রচ্যুতি—

'ধূমকেতু' কেন্দ্র ৭নং প্রতাপ চাটুয্যের লেন-এ উঠে এসেছে। অতঃপর চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিনিময়ের কাগজ সবই এই ঠিকানায় 'ধূমকেতু'র একমাত্র স্বত্বাধিকারী কাজী নজরুল ইসলামের নামে পাঠাতে হবে।"

এই কেন্দ্রচ্যুতির পর আফজালুল হক সাহেবের সঙ্গে 'ধূমকেতু'-র আর বিশেষ কোনো যোগ ছিল না। তবুও প্রথম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায় (মঙ্গলবার,

৯ আশ্বিন, ১৩২৯ সাল মোতাবেক ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ খৃষ্টাব্দ) কবির "আনন্দময়ীর আগমনে" মুদ্রিত হতেই তাঁর নামে যে গ্রেপ্তারীর পরোয়ানা বার হয় তাতে হক সাহেবকেও বন্দী হতে হয়। কেননা পত্রিকার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ না থাকলেও প্রকাশক ও মুদ্রাকর হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হচ্ছিল। কিন্তু চার দিন আটক রাখার পর আফজালুল হক যে নির্দোষ এমন প্রমাণ পেয়ে সরকার পক্ষ তাঁকে মুক্ত করে দেবেন এমন সময় কুমিল্লা থেকে নজরুলকে ধরে আনা হল কলকাতায়। ফলে হক সাহেবের মুক্তি-দিবস আরো কিছুদিন পেছিয়ে গেল। শেষে সরকার পক্ষ স্থির করলেন হক যদি তাঁদের প্রয়োজন মতো কোর্টে এসে সাক্ষী দিতে রাজি থাকেন তাহলে তাঁরা তাঁকে ছেড়ে দেবেন।

বলাবাহুল্য হক সাহেব তাতেই রাজি হলেন।

হক সাহেবের প্রদত্ত সাক্ষ্য বিচারাধীন বন্দী নজরুলের অনেক উপকারে এসেছিল।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

খোকন গেছে কার নায়

না, নেই—কলকাতার কোনো হাসপাতালে বছর আঠারো বয়েস সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা বাঁ গালে তিল কোঁকড়ানো চুল ফর্সা রঙ পরনে শাদা ট্রাউজার গায়ে বাদামি শার্ট নীল জাম্পার ডিগ্রি কোর্স সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র অধ্যাপক পরমেশ মুখুজ্জের ছেলে প্রেমতোষ ওরফে খোকা বলে কেউ নেই।

স্বস্তির কথা সন্দেহ নেই।

মহী বলে, 'আমি আগেই বলেছিলাম! অনর্থক—আমার চা?'

মমতা বলে, 'রাধাদি আনছে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছল।'

চায়ের অভাবে সিগারেট। সিগারেটের প্যাকেট বের করেই খেয়াল হয় সামনে বাবা। 'তুমি আর কেন মিছিমিছি—'

পরমেশ নড়েচড়ে বসে। ঘুম থেকে উঠে গীতা পাঠ। সারা দিনের মতো মনটা ধাতস্থ হয়ে থাকে। আত্মবিশ্বাস দানা বাঁধে। অভ্যেসটা আজ চিড় খেল। উপায় কি! দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'আরেক কাপ চা দেবে, বাবা?'

'হাওড়ায় ফোন করেছিলি? হাওড়ার হাসপাতালে?'

'হাওড়ায়?' পাল্টা প্রশ্নে মহী হকচকিয়ে যায়। 'হাওড়ায় তো কিছু হয় নি, বাবা।'

হয় নি! কোথায় কী হচ্ছে না-হচ্ছে জোর করে বলা যায়? কলকাতায় হলে হাওড়ায় হবে না—এমনিতেই রোজ একটা-না-একটা হাঙ্গামা যেখানে লেগেই আছে? 'করলে পারতে—করলেই যখন।'

তুই থেকে তুমি! তার মানে বাপের মন মানছে না।

বাবা এমন অবুঝ আগে যদি বুঝত!

আগে বুঝলে করত আরেকটা ফোন। খানিক আগে বুঝলেও বলত করেছি ফোন।

দরাজ গলায় মহী বলে, 'তুমি মিথ্যে ভাবছ। আমি বলছি ওর কোনো বিপদ হয় নি। নাকি বলো, অশোক ?'

অশোক বলে, 'না না, বিপদের কী আছে।'

মায়া বলে, 'বালাই ষাট ! খোকার কেন বিপদ হতে যাবে।'

মমতা বলে, 'বিপদের ধারেকাছে ছোড়দা—'

ইন্দু বলে, 'বিপদের ভয় দেখলে ঠাকুরপো—'

খোকা হাসপাতালে নেই শুনে সুনীতি হাঁফ ছেড়েছিল, খোকার কোনো বিপদ হয় নি বলে জোর গলায় সকলের জানান্ দেওয়া শুনে বুকটা তার এখন ছ্যাঁৎ করে ওঠে: বিপদের আশঙ্কা তাহলে আছে ? হাসপাতালে না থাকলেও আছে ?

'তবে গেল কোথায় ?' গলা সুনীতির থরথর করে, 'কাল সেই কখন বেরিয়েছে—'

'হয়তো কোনো বন্ধুর বাড়ি—'

'যে-ছেলে কখনও সন্ধ্যের পর বাইরে থাকে না—'

'যেমন হুটহাট কার্ফু বসছে—'

অশোক বলে, 'তাই। হঠাৎ কার্ফু হয়ে যাওয়ায়—'

পরমেশ বলে, 'তাহলে একটা ফোন করে দিত না ?'

সুনীতি বলে, 'হ্যাঁ, ফোন করে দিত না ? এভাবে না বলে-কয়ে—'

তৈরি চা ফেলে ফোন করতে ছুটল, তা সত্ত্বেও বাপ-মায়ের এই জেরা-জিজ্ঞাসা ? মহী বলে, 'তাই যদি বলো মা, কাল ওর বাড়ি থেকে বেরনোই উচিত হয় নি। বাবার কলেজ বন্ধ, মমর ইশকুল বন্ধ, বেলা তিনটেয় আমি আপিশ থেকে চলে আসি, অশোক অব্দি বাড়িবন্দী হয়ে আছে—' গলা ধাপে ধাপে চড়ছিল, কিন্তু রাগারাগিটা এখন নেহাতই বেমানান বুঝে আচমকা মহী থেমে যায়।

গুম হয়ে যায়।

সত্যিই বেরনো উচিত হয় নি। পরমেশও স্বীকার করে। কিন্তু এখন সেকথা তুলে লাভ ? 'তোদের কিছু বলে গিয়েছিল ?'

মায়া বলে, 'নাঃ।'

মমতা বলে, 'না তো।'

'বৌমা ?'

ইন্দু শুধু মাথা নাড়ে। এমনভাবে নাড়ে যার মানে হ্যাঁ হতে পারে, না-ও হতে পারে।

গুরুজনের মুখোমুখি মিথ্যে বলা যায় ? তার ওপর খোকা ফিরে যদি ধমকধামকের চোটে বলে বসে—বৌদিকে তো আমি বলেই গিয়েছিলুম ?

মায়া বলে, 'দাদা ঠিকই বলেছে, বাবা। কারো বাড়ি গিয়ে আটকা পড়েছে, ফোন করার অসুবিধে থাকায়—'

'এতক্ষণে আসা উচিত ছিল। সাতটা বাজে।'

'ট্রামবাসের গোলমালে—'

'ট্যাক্সি করে আসতে পারত।'

দু-দুটো জোরালো সম্ভাবনা পলকে বাপ খারিজ করে দিতে মেয়ে যায় ঘাবড়ে।

অশোকও যায়। বউয়ের চোখমুখ দেখে ঘাবড়ে যায়: বাপের বাড়িতে প্রথম মা হতে আসার সাধ বেচারীর মাথায় উঠেছে। ফিরে যাওয়ার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে।

বাইরের খবরাখবর শুনেই ক্ষেপে উঠেছে, এরপর ভাইয়ের জন্যে দুশ্চিন্তাটা যদি জেঁকে ধরে, ভালোমন্দ কিছু হয়ে যায় ভাইয়ের—নির্ঘাত হার্টফেল করবে।

ছেলে পেটে আসায় হার্টটা যেমন শত্রুতা শুরু করেছে !

অশোক বলে, 'যদি অ্যারেস্টেড হয়ে থাকে ? মানে—কার্ফুতে ?'

সুনীতি কঁকিয়ে ওঠে।

'হাসপাতালে থাকার চেয়ে পুলিশের হেফাজতে থাকা ভালো।' তাড়াতাড়ি অশোক বুঝিয়ে দেয়। 'হাজার হলেও—'

'তা বাপু ভালো। কার্ফুতে অ্যারেস্ট হওয়া ঢের ভালো।' অকূলে মায়া কূল পায়।

মহীরও মনে হয়, কথাটা অশোক ভালোই বলেছে। পুলিশ অবশ্য মারধোর করে, তবে খোকার গায়ে নিশ্চয় হাত তুলবে না। পুলিশ লোক চেনে।

ইন্দু প্রার্থনা করে: খোকাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখ, ঠাকুর! প্রতিজ্ঞা করে: আসুক-না ফিরে, বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র ফাঁস করে দেবে লুকিয়ে লুকিয়ে সিনেমা দেখার কথা। হিন্দী সিনেমা দেখার কথা !

তার কথা সকলের মনে ধরেছে, বিশেষ করে বউয়ের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেখে সোৎসাহে অশোক বলে, 'কোনো সন্দেহ নেই। গুণ্ডা-বদমাশদের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না, ওদের যত দাপট ইনোসেন্টদের ওপর। কে না জানে, নিরীহ-নির্দোষরাই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।'

সকলেই জানে। সায় দেয়।

'কিন্তু', সায় দিয়েও স্থনীতির সন্দেহ যায় না, 'থানায় ওর নাম বললে ছেড়ে দিত না?'

'রাত্তির বেলা—'

'ছেড়ে না দিক, ফোন করত।' পরমেশ বলে, 'খোকাও করতে পারত।'

'অত রাত্তিরে—'

'যত রাত্তিরেই ফোন আস্থক নন্দী ফার্মেসী জানিয়ে দিত। দেয় না?'

অস্বীকার করার যো নেই।

ওষুধে যত গলাই কাটুক, ফোনের খবর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে নন্দী ফার্মেসী ষোল আনা সাচ্চা।

সাধেই প্রতি ফোন বাবদ আট আনা দিয়েও পাড়ার লোকে ওখানে যায় ফোন করতে। দাম বেশি জেনেই ওষুধ কিনতে।

তাহলে? খোকা তাহলে কোথায়?

হাসপাতালে নেই, বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যায় নি, পুলিশেও ধরে নি—তাহলে?

সকলেই জানতে চায়। কিন্তু চাই চাই করেও কেউ কারো মুখের দিকে চাইতে পারে না।

কদিন-ধরে-শোনা খবরের-কাগজে-পড়া বীভৎস-ভয়ঙ্কর নানান কাহিনী মনে পড়ে গিয়ে বুক উথলে দম আটকে চোখে আঁধার ঘনিয়ে হাত-পা স্থনীতির অবশ হয়ে আসে, দরজা ধরে সামলাতে সামলাতে 'ওরে খোকা!' বলে চাপা আর্তনাদ তুলে চৌকাঠের ওপর ধপ করে বসে পড়ে।

'মা!'

'মা!'

'মা!'

মমতা তাড়াতাড়ি উঠে যায়। 'তুমি কী মা! ওঠো, ঘরে চল। ছোড়দার কিছু হয় নি। কিচ্ছু—'

মেয়েকে টেনে বসিয়ে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে স্থনীতি।

'ন্যাখ কাণ্ড!'

'মিথ্যে আপনার আশঙ্কা, মা। কলকাতা পাকিস্তান নয়। এখানে কোনো হিন্দুর—'

'অশোক ঠিক বলেছে, মা। কলকাতায় হিন্দুদের ভয় কিসের!'

'নেই? পরশু বিধান রায়ের বাড়ির সামনে—তুই দেখিস নি? বলিস নি? —ওরে খোকা!' স্থনীতি হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।

নিজের চোখে মহী দেখে নি, দত্ত দেখেছে। কিন্তু ওই সময় দত্তর বদলে বা দত্তর সঙ্গে বাসে থাকলে সে-ও দেখত নাকি? ঘটনাটা যখন সত্যি?

ঘটনাটা জীবন্ত করার জন্যে নিজের চোখে দেখে এলাম বলে জানিয়েছে, ঘটনাটা রোমাঞ্চকর করার জন্যে মুসলমানকে হিন্দু বানিয়েছে।

হায়, এভাবে তার জের টানতে হবে কে ভেবেছিল!

অশোকের দিকে ব্যাকুলভাবে তাকায়: কাল বিশ্বাস কর নি, তর্ক জুড়েছিলে—এখন কেন চুপচাপ?

বউয়ের দিকে তাকিয়ে বুক অশোকের গুরগুর করে: দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, দুই চোখ ঠেলে বেরিয়েছে—ফিট হওয়ার ভূমিকা নয় তো?

বিয়ের পর বন্ধ হয়ে গেলেও ইদানীং মাঝে মাঝে ফিট-ফিট ভাব হচ্ছে না? রাতভর বুকে রেখে বারবার ডাক্তারের কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে সামলাতে হয় না?

তবু যদি ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে ফিট হয় মন্দের ভালো, কিন্তু এখানেই ফিট হয়ে চেয়ার উল্টে পড়লে—

মাথা অশোকের ঝিমঝিম করে।

'আমি বলছি মা,' অশোকের সাহায্য না পাওয়ায় টেবিলে ঘুঁষি মেরে বক্তব্যটা মহী জোরদার করতে চায়, 'কলকাতায় হিন্দুদের—'

'প্রবোধ দিচ্ছিস? আমায় মিথ্যে বোঝাচ্ছিস মহী! মিথ্যে! মিথ্যে! ওর কুষ্ঠি দেখে ঠাকুরমশায় বলেছিলেন—।' স্থনীতি গুমরে গুমরে ওঠে। ফাঁড়ার বয়েসটা অবশ্য কেটে গেছে। কিন্তু বয়েস কেটে গেলেই ফাঁড়া কেটে যাবে তার নিশ্চয়তা কী? শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করেছিল বলে হয়তো দুটো বছর পিছিয়ে গেছে, গোঁয়ার্তুমি না করে খোকা যদি মাদুলীটা ধারণ করত!

সে-ও যদি ব্যাপারটার ওপর গুরুত্ব দিত !—অকথ্য অপরাধবোধে প্রাণটা স্থনীতির ফেটে যেতে চায়।

অশোক বলে, 'আচ্ছা, স্টুডেন্টদের যে-প্রসেশন বেরোয়—'

'ছোড়দা ওসবে নেই।'

পলিটিকস নয়, ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। পরমেশের কড়া শাসন। কিন্তু প্রসেশনে না গেলেই কি রেহাই মেলে ? যদি কলেজ লাইব্রেরীতে গিয়ে থাকে ? কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে থাকলেও—। আর্তকণ্ঠে পরমেশ শুধায়, 'ওকথা কেন বললে বাবা, ওকথা কেন বললে !'

অশোক কিছু ভেবে বলে নি। টেবিলে হেঁট হয়ে থাকায় মায়াকে চোখে চোখে চাওয়াতে না পেরে গলার আওয়াজটা শোনাতে চেয়েছিল : তার কথা শুনে মায়া নিশ্চয় তাকাবে। সঙ্গে সঙ্গে ইশারায় তাকে ঘরে যেতে বলবে।

নিজেও যাবে।

'চলো, ঘরে চলো' বলে সকলের সামনে বউকে তো আর ঘরে নিয়ে যেতে পারে না। ঘরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনটা এখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠলেও।

'বাবা অশোক—!'

'না, এমনি—হঠাৎ মনে হল—'

'ভূদেব সেনের কথা ?'

'অ্যাঁ !' মায়া চমকে ওঠে।

মায়ার চমকানো দেখে অশোক নার্ভাস হয়ে যায়।

'খোকারই মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলে—'

'বাবা !'

'কলেজের মধ্যেই ছিল—'

'দেখুন, ওই একটাই যা—মানে দৈবাৎ—'

'একটা !' জামাইকে ধমক দিয়েই স্থনীতি ফুঁপিয়ে ওঠে। 'দিনদুপুরে মিছিল থেকে চার-চারটে ছেলেকে—'

মহী বলে, 'যত্ত সব বোগাস !'

'খবরের কাগজে বেরোয় নি ?'

'তুই-ই—'

বেরিয়েছে। মহীই সে-খবর পড়ে শুনিয়েছে। কিন্তু অশোকই না তখন 'যত্ত সব বোগাস !' বলে চেঁচিয়ে ওঠে ?

আর এখন ?

যেন শুনতেও পায় নি। কেমন ড্যাবডেবিয়ে চেয়ে আছে মায়ার দিকে। বেহায়ার বেহদ্দ কাঁহাকা !

গা কিসকিস করে মহীর। 'কী ব্যাপার বলো দেখি তোমাদের ? চা পাব, না পাব না ?' বউয়ের ওপর ফেটে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দু উঠে পড়ে।

মমতা বলে, 'তুমি বসো বৌদি, আমি দেখছি।'

'না, আমি যাই।'

'বাচ্চা উঠলে—'

ইন্দু ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছে।

আন্দাজী কথা সকলে বলছে, অথচ জানা সত্ত্বেও খোকার সিনেমায় যাওয়ার কথাটা সে জানাতে পারছে না। এখানে বসে থেকে সে-কথা চেপে রাখায় যে কী অস্বস্তি !

এখন আর বলাও চলে না। খোকা না ফেরা পর্যন্ত সব ধাক্কা তাকেই তাহলে পোয়াতে হবে।

কিন্তু—। রেলিং ধরে ইন্দু থমকে দাঁড়ায়। সিনেমা থেকে ফিরতে নটা বড় জোর দশটা হতে পারে। সারা রাত—বুক ইন্দুর ধড়াস ধড়াস করে।

এদিকে দু-হাতে বুক থাবড়ায় স্থনীতি : শুধু ঠাকুরমশায় নয়, গণক ঠাকুরও হাত দেখে ফাঁড়ার কথা বলেছিল। কেউ তখন গ্রাহ্য করে নি। কেউ না ! কেউ না ! কেউ না !

'মা !'

'মাকে নিয়ে তো মহা মুশকিল হল !'

'মিছিমিছি আপনি—মা !'

'ওকে কাঁদতে দাও, অশোক।'

'আপনিও—।'

'তুমিও বাবা—!'

'আমি ঠিক আছি ! আমি ঠিক আছি !'

পরমেশের মতো রাশভারী মানুষও যদি ভেঙে পড়ে, বাড়িতে মড়াকান্না পড়ে যাবে। নিরর্থক।

মহীর মন বলছে নিরর্থক। খোকা নিশ্চয় কুশলে আছে। বিপদে পড়ে থাকলেও চরম অমঙ্গল খোকার হতেই পারে না।

খোকা যে মহীর বড় গর্বের ভাই। পাঁচজনের কাছে বুক ফুলিয়ে খোকার কথা যে মহী বলে বেড়ায়। চেহারায় লেখাপড়ায় হীরের টুকরো খোকার কথা।

সেই খোকা কিনা এমন বেকায়দায় তাকে ফেলল!

খোকার প্রতি ভালোবাসাটা খোকার অভাবে তীব্র আক্রোশে পরিণত হয়ে যায়। 'জানে বাড়িশুদ্ধ সবাই ভাববে—দিনকাল খারাপ—তবু একটা খবর পর্যন্ত না দিয়ে—' মহী দাঁতে দাঁত ঘষে, 'এমন ইরেসপনসিবল্ ছেলেকে ধরে চাবকানো উচিত।'

'ফিরে আসুক—'

'আসুক না একবার—'

'যদি আসে—'

'যদি আসে! কী বলছ বাবা?'

'হ্যাঁ, যদি আসে!' সশব্দে শ্বাস ছেড়ে পরমেশ উঠে দাঁড়ায়।

ভাম হয়ে থাকে সবাই। সুনীতি ফোঁপায় দমকে দমকে।

'ঘরে চলো।' দরজা থেকে সুনীতিকে প্রায় জোর করেই ঘরে নিয়ে গিয়ে পরমেশ দরজা ভেজিয়ে দেয়।

ঘর থেকে সুনীতির আথালি-পাথালি কান্না শোনা যায়। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে পরমেশের ফোঁপানি।

মায়া বলে, 'কী হবে!'

মমতা বলে, 'কী হবে দাদা!'

মহী সিগারেট ধরায়।

অশোক বলে, 'বুড়ো মানুষ তো—সামান্যতেই—'

'পাড়ায় একবার খোঁজ নিলে হত না?'

'পাড়ায় মেশে ছোড়দা? তুই জানিস না দিদি?'

জানে আবার না! বছরখানেক পরবাসী হলেও পাঁচ-পাঁচটা বছর এই পাড়ায় কাটিয়ে গেছে না? চোখ-কান বুজে কলেজে যাওয়া-আসা করতে হত না?

তার ওপর, পাড়ায় খোঁজ নিতে যাওয়া মানে পাড়াকে বাড়িতে ডেকে আনা। শিক্ষিত পরিবার বলে দূরে সরিয়ে রাখলেও, মডার্ন পরিবার বলে আড়ালে ঠাট্টা করলেও, চাঁদার গরজে ছাড়া এ-বাড়ির ছায়া কেউ না মাড়ালেও —শোক-সহানুভূতি জানাতে দল বেঁধে সবাই হামলে আসবে। সবার আগে হাবুল।

তখনই হাঁ করে চেয়ে থাকত, এই অবস্থায় দেখলে—

সস্নেহে মায়া পেটে হাত বুলোয়: না, মরে গেলেও কাঁদবে না। চিৎকার করে কাঁদবে না। কাউকে কাঁদতে দেবে না। চিৎকার করে কাঁদতে দেবে না। কেন কাঁদবে? খোকার কিছু হয়নি। ঠিকই বলেছে ও। মনকে সব সময় হাসিখুশি রাখা দরকার। ডাক্তার বলেছে। তাহলে আর কাঁদার কথা ওঠে কেন? খোকার যখন কিছু হয় নি, খোকার কিছু হয়নি, খোকার কিছু হয়নি, খোকার কিছু হয়নি, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি, হয়নি, হয়নি, হয়নি—

'কিছু বলছ?' অশোক শুধায়।

'অ্যাঁ!' বিড়বিড় করছিল টের পেয়ে মায়া থরথর করে কেঁপে ওঠে।

ইন্দু এসে জানায়, 'চা হবে না।'

'কেন? চা হবে না কেন?' মহী দপ করে জ্বলে ওঠে।

'রাধাদি করতে পারবে না। কাঁদছে।'

'কাঁদছে!' মহী দপ করে নিভে যায়। মাইনে-করা মানুষটা তার ভাইয়ের জন্যে কাঁদছে! 'তা তুমিও তো করে আনতে পারতে?'

'দরজা আগলে বসে কাঁদছে। ঠাকুরপো না ফেরা পর্যন্ত নিজে কিছু করবে না, কাউকে করতে দেবেও না।'

'বেচারা!'

'আহা!'

'খুব ভালোবাসত ছোড়দাকে।'

'বাসত না, বাসে বল।'

'বাসে, বাসে।'

'নিজের ছেলের মতো।'

ছেলের মতো নয়, ছেলেই। প্রথম দিনেই কী ভাবে খোকাকে বুকে চেপে ধরেছিল—চোদ্দ বছরের পুরনো দৃশ্য আজও মহীর চোখে ভাসে।

পাট ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে দশজনে খুবলে খুবলে খায়, স্বামী সমেত সারা গুষ্টিকে কুপিয়ে কুপিয়ে শেষ করে, তাতেও সাধ মেটেনি—হাত-পা বেঁধে তিন বছরের খোকাকে তার জলন্ত ভিটায় ছুঁড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখে, আধমরা রাধাকেও ধরে রেখে দেখায়।

এই খোকাকে বুকে নিয়ে সেই খোকার অভাব ভুলেছে। সামনে বলে খোকাবাবু, আড়ালে খোকাবাবা। সবাই জানে।

ঠেলে-আসা দীর্ঘশ্বাসটা গিলে ফেলে মহী শুধায়, 'কী করা যায় বলো তো অশোক ?'

'তোমার টনিকটা'—

'কী বললে ?'

'হুঁ, বড় ভাবনার কথাই হল।' অশোক সামাল দেয়।

টনিকটা খাওয়া হয়নি। হর্ললিকস খাওয়া হয়নি। খাওয়ার কথা মায়া অবশ্য ভাবতেও পারছে না, তবু খেতে হবে। মায়া উঠে দাঁড়ায়।

শুধু নিজের কথা ভাবলে মায়ার চলে! মা হওয়া মুখের কথা! মায়া চলে যায়।

'আমার মন অবিশ্যি বলছে—'

মনে মনে দাদাকে মুখ ভেঙায় মমতা। তার দৃঢ় বিশ্বাস শিখার দাদা সুব্রতদা নিশ্চয়ই যেখান থেকে হোক খোকাকে খুঁজে-পেতে নিয়ে আসতে পারে। সুব্রতদা তার দাদার মতো ভীরু নয়, দাঙ্গার ভয়ে আপিস থেকে পালিয়ে এসে ঘরে বসে লম্বাচওড়া কথা বলে না।

কিন্তু হায়, সুব্রতদার কথা বাড়ির কাউকে বলা যাবে না! অত কাজের হওয়া সত্বেও খোকাকে খুঁজে আনার কাজে সুব্রতদাকে লাগানো যাবে না!

'তবু দুশ্চিন্তা—নাকি বলো অশোক! তুমি ঠিকই বলেছিলে—গুণ্ডা আর অ্যান্টিসোস্থাল—' গলা চিরে কাল অশোকের প্রতিবাদ করলেও আজ মহীর মনে হয় অশোকের কথাই ঠিক। পাকিস্তানে যাই হোক এখানকার মুসলমানরা তার ফল ভোগ করবে কেন? গুণ্ডাবদমাসদের লাই দেওয়া উচিত নয়। ওরা মাথায় চড়ে বসলে পরিণাম ভয়াবহ। মুসলমান ফুরিয়ে গেলে হিন্দুর ওপর হামলা শুরু করবে। করে নি গত দাঙ্গার পর? 'গবর্নমেন্টও তেমনি। ওদের নাড়িনক্ষত্র জানে, ইচ্ছে করলে এক ঘণ্টায় হাঙ্গামা থামাতে পারে—কিন্তু সর্ষের মধ্যেই ভূত—নাকি বলো?'

কাল বললেও আজ আর অশোক বলে না। আজ মনে হয় মহীর কথাই ঠিক—পাকিস্তানে হিন্দুরা এক তরফা মার খায়, এখানকার মুসলমানরা পাল্টা মারও দেয়। পাকিস্তানের দাঙ্গায় কখনো মুসলমান মরে না, এখানকার দাঙ্গায় হিন্দুও মরে।

দিদির বড় নেওটা ছিল। দিদিও বড্ড ভালোবাসত ভাইকে। অশোকের দৌলতে মা হতে চলেছে, তবু সাধ, ছেলে যেন তার দেখতে-শুনতে মামার মতো হয়। ছোট মামার মতো। খোকার যদি কিছু হয়—মায়াকে বাঁচানো যাবে!

'বাচ্চা বোধ হয় উঠল, বৌদি।'

'উঠল?' ইন্দু উঠে পড়ে।

মমতাও। বৌদিকে যদি বলা যায় সুব্রতদার কথা। বুকে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করিয়ে বলা যায় যদি।

'থানায় একটা খবর দিয়ে রাখলে হয় না?'

'ঠিক বলেছ।' বাড়ির বড় ছেলে, অথচ হাত পা গুটিয়ে বসে আছে! অশোকের প্রস্তাব শুনে মহী বর্তে যায়। 'চলো, বেরনো যাক।'

থানায় খবর দিয়ে হবে কচু। খোকা কি ছোট্ট খোকা, না বাড়িতে রাগারাগি করে নিরুদ্দেশ?

কিন্তু বেরনো দরকার। বাড়ি থেকে থানা। থানা থেকে কাজের অছিলাতে এসপ্লানেড কি ড্যালহৌসি।

নিজের নামে জরুরী তার: ছুটি নাকচ, এক্ষুণি জয়েন কর।

মাথায় থাকুক কলকাতার নামী নার্সিং হোম!

খোকার ভালোমন্দর ওপর অশোকের হাত নেই, কিন্তু মায়ার ভালোমন্দ তার দেখা কর্তব্য।

হাসপাতালে খোকা নেই। কিন্তু সব আহত কি হাসপাতালে পৌছোয়? লাশ অনেক সময় গুম হয়ে যায় না? দশ-বারো দিন পরে হদিশ মেলে না?

খোকাও নির্ঘাত কোনো মুসলমান গুণ্ডার হাতে—

'চলুন মহীদা।'

অশোক তাড়া দেয়। গুণ্ডার হাতে খুন-হয়ে-যাওয়া খোকার খবর এসে পৌছনোর আগেই জরুরী তারের পৌছনো দরকার।

বেরনোর দরকার শেষ অবধি হয় না।

সদরের মুখেই দেখা।

পরনে ধুতিপাঞ্জাবী। গায়ে গরম চাদর।

দাদা-জামাইবাবুকে দেখে খোকা থমকে দাঁড়ায়।

খোকা ফিরেছে! খোকা ফিরেছে! খোকা ফিরেছে!

হুই হুই করতে করতে সবাই নেমে আসে। পরমেশ স্নীতি মায়া মমতা ইন্দু মহী অশোক রাধা সবাই ঘিরে দাঁড়ায়।

মুখখানা হাসি হাসি করে, সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে খোকা পা বাড়ায়।

'সারা রাত কোথায় ছিলি রাস্কেল।' খপ করে মহী তার কাঁধ খামচে ধরে।

অশোক সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে দেয়।

স্নীতি হাঁ হাঁ করে এসে ছেলেকে আগলে ধরে।

'কোথায় ছিলি বাবা, অ্যাঁ? তোর জন্যে ভেবে ভেবে—'

'আচ্ছা লোক তুমি ছোড়দা!'

'ছি খোকা ছি, তোর জন্যে আমরা সবাই—'

'আমি সব বলে দেব ঠাকুরপো—হাঁ।'

কারো কথার জবাব না দিয়ে খোকা গিয়ে তার ঘরে ঢোকে। পিছে পিছে মিছিল করে আসে সবাই। মিছিলের নেতা মহী।

শুধু ভু ঘা দিতে পারল না বলে নয়, এত বড় অন্যায় করেও খোকাকে নির্বিকার দেখে মহীর সারা শরীরে জ্বালা ধরে যায়।

'কেন কাল বাড়ি থেকে—'

'দরকার থাকলে বেরোব না।'

দাদার ধমকে কোথায় কেঁদে ফেলবে, তা নয় মুখে মুখে জবাব! প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই জবাব! রাগে মহী এমনই দিশেহারা হয়ে যায় যে মুখে তার কথা সরে না।

মায়া শুধায়, 'কোথায় ছিলি সারা রাত?'

'নন্দদের বাড়ি।'

'নন্দ?'

'আমার বন্ধু।'

'বন্ধু! বন্ধুর বাড়ি রাত কাটাতে যাওয়া হয়েছিল কেন শুনতে পারি?'

'খুলনায় ওর মা-বাবা খুন হয়েছে। শুনে গিয়েছিলাম। অন্যায় করেছি?'

খোকা টান টান হয়ে দাঁড়ায়। 'কী, অন্যায় করেছি?'

ভয়ানক দমে যায় মহী।

পরমেশ বলে, 'জানিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।'

'আমিই কি আগে জানতাম বাবা।'

ইন্দু বলে, 'যখন দেখলে ফিরতে পারছ না—একটা ফোন—'

'হাবড়া থেকে—'

মায়া বলে, 'হাওড়া তো গঙ্গা পেরোলেই—'

'হাওড়া নয়, দিদি—হাবড়া। বনগাঁ লাইনে।'

মমতা বলে, 'ভোরেই চলে আসতে কী হয়েছিল?'

'ট্রেন আমি চালিয়ে আসব?'

চটপট জবাব। খোকা অবিশ্যি খুবই স্মার্ট, কিন্তু এ সময় এতখানি স্মার্টনেস অশোকের কেমন কেমন ঠেকে। এমন বেপরোয়া স্মার্টনেস। চোখ-মুখ শুকনো। মনে হয় সারা রাত শরীরের ওপর দিয়ে জোর ধকল গেছে। মা-বাবার শোকে বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর মনও ভেঙে পড়া স্বাভাবিক। চটপট জবাব দিয়ে তাই রেহাই পেতে চাইছে?

অশোক বলে, 'চলুন সবাই। ও কাপড়চোপড় ছেড়ে আসুক। বৌদি এবার—'

ইন্দু হাসি হাসি মুখে রাধার দিকে তাকায়।

চোখের জলে ধোয়া ভাঙাচোরা মুখখানা রাধার হাসিতে চিকচিক করে, 'দিমু জামাইবাবু। অখনি দিতাছি। কারো কিছু করন লাগব না—আপনেরা বয়েন গিয়া।' বলতে বলতে রাধা হেঁসেলে চলে যায়।

মমতা বলে, 'তুই না প্যান্ট পরে গিয়েছিলি ছোড়দা?'

'গিয়েছিলাম তো। আছাড় খেয়ে—'

'আহা হা! লাগে নি তো বাবা! লাগে নি তো!'

'কাদা লেগেছে।' খোকা গায়ের চাদর খোলে। কাগজে মোড়া প্যাকেটটা বিছানায় রাখে।

'বিছানায় ওই নোংরা কাপড়চোপড়'—

'নোংরা না, মা, কাদা লেগেছে বললাম না।'

'তা হোক, তুই নিচে রাখ। রাধা কাচতে দিয়ে আসবে থন।'

'না। চাটা খেয়ে আমিই দিয়ে আসব' বলে খোকা বাথরুমে চলে যায়।

ফের বসে চায়ের আসর।

গরমাগরম লুচি হালুয়া।

আসরের খোলকলা পূর্ণ হয় খোকার ঘর থেকে হঠাৎ ভেসে-আসা রবীন্দ্রসঙ্গীতে: আমরা, নূতন যৌবনেরি দূত।

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে খোকা লাফিয়ে ওঠে, পড়িমরি করে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে।

'কী ব্যাপার। কী ব্যাপার।' করতে করতে পিছু পিছু আসে আর সবাই।

ইন্দুর হাতে ট্রানজিস্টার। এক গাল হাসে ইন্দু।

খোকা গর্জে ওঠে, 'কেন তুমি ওটা বের করলে? কেন তুমি—।'

'ডাইং ক্লিনিংয়ে পাঠাব বলে প্যাকেটটা খুলতে—'

'কে তোমায় প্যাকেটে হাত দিতে বলেছিল?'

খপ্ করে অশোক হাতটা না ধরে ফেললে খোকা বুঝি ইন্দুর ওপরে ঝাঁপিয়েই পড়ত। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত ইন্দুকে: কেমন ধকধক করে জলছে দুই চোখ, দাঁতে দাঁতে শান্ দিচ্ছে—কী অমানুষিক হিংস্র হয়ে উঠেছে মুখখানা!

'তাসের দেশের গান, নারে দিদি?'

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাসের দেশের গান! তাসের দেশের গান! প্যান্টের ওই দাগ কিসের? কাদার? জলে ধুলে কাদার রঙ কি লালচে হয়ে যায়! অশোক অপলক।

'কেন তুমি ওটা খুললে!' খোকা গলা চিরে ফেলে। ঝিমিয়ে পড়ে। পিছু হটে।

খোকাকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি প্যান্টটা যাতে মায়ার নজরে না পড়ে অশোক সরে দাঁড়ায়।

'বেশ গাইছে, নারে দিদি।'

তোফা গাইছে। মেয়েপুরুষের খাসা কোরাস।

'আরও জোর করে দিন বৌদি, আরও জোর করে দিন—কোরাস তা না হলে জমে না।' গলা ফাটিয়ে বলে অশোক।

এবং অধ্যাপক পরমেশ মুখুজ্জে সপরিবারে গান শোনে। নির্ভেজাল রবীন্দ্রসঙ্গীত।

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

অগ্নিস্পর্শ

'দুধও খাব, তামাকও খাব'—এই 'গভাচর চন্দ্রী' সাধ আমারও কিন্তু জন্মগত। শুধু স্বাধীনতা চাই বা তদভাবে সাহিত্যরসের আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকো, এমন কথা অগ্রাহ্য। পাকামিটাও বোধ হয় মজ্জাগত, অন্তত কতকাংশে আমাদের বৈঠকখানাগত। না হলে ওবয়সে বঙ্কিম, মাইকেল প্রভৃতির ডাকে বাবার বই-এর আলমিরার চাবি সংগ্রহের বুদ্ধি এল কোথা থেকে? স্বাদেশিকতার ঝোঁকও ভেতরবাড়ি ও বৈঠকখানার টানা-পোড়েনে সেই সঙ্গে, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের মতো, এক-আধ গজ করে বেড়ে যাচ্ছিল। মেজ জেঠাইমার সকল জিনিসেই ঔৎসুক্য—মামা তাঁরই সহোদর; স্বদেশীতেও জেঠাইমা তাই উদাসীন নন। কিন্তু মামা কেন, আত্মীয়স্বজন সকলকেই তিনি আবার মমতার বশে সেই আগুনের আঁচ থেকে আড়াল করে দূরে রাখতেও উদ্গ্রীব। অথচ যুগটাই যে অগ্নিযুগ। হাওয়া বইলেই ছাইচাপা আগুনের দু-এক ঝলক দেখা দেয়। মোহনবাগান শীল্ড্ পেল। সে উৎসাহ পূর্ব-বাঙলার ওই ছোট শহরেও ছড়িয়ে পড়ল। শিব ভাদুড়ী, বিজয় ভাদুড়ী প্রভৃতি হিরোদের নামগোত্র আমাদেরও মুখস্ত, ছবিও কখনো কখনো বেড়া-স্থ। যিনি জীবনে ফুটবল কেন, কোনো খেলাই খেলেন নি, আমার সেই দাদা সে জয়-বর্ণনা দশগুণ প্রাণবন্ত করে তুললেন মুখে মুখে। বাবার ক্রিকেট-ফুটবলে উৎসাহ ছিল না। এই বিজয়ের উচ্ছ্বাসকে তিনি মৃদু পরিহাসে সংযত করতে ছাড়তেন না। তবু প্রিন্স রণজিৎ সিং থেকে ঢাকার সেদিনের অধ্যাপক এস. রায়., এ নামগুলো আমরা জপ করতাম। আর ভাবতাম, না, এদিকেও জাতির অখ্যাতি দূর না করলেই নয়। ঈটনের মাঠে ওয়াটার্লুর জয়, ইংরেজি প্রবাদ। কিন্তু কলকাতার ময়দানে ফুটবল নিয়ে ভারত-উদ্ধারের মহড়া—আমারও প্রত্যক্ষ সত্য। সে অবশ্য কলেজ জীবনের

কথা। আপাতত ১৯১১-এর মোহনবাগানের জয়ে ফুটবল থেকেও যে স্বদেশীর ফুলকি ফুটে বেরুল বাড়ির কে তা বুঝবে? আরও কতখান থেকে যে তা বেরুচ্ছে, তাই বা কে জানে? রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ই কি জানতেন—কিম্বা বাবা বা দাদা বুঝতেন—'প্রবাসী'র পাতা থেকে এক অবোধ কিশোর একটুও না বুঝলেও কী বুঝত, আর কী আগ্রহে পড়ত রামলাল সরকারের ১৯১১-এর চীনা বিপ্লবের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত? কিম্বা কেমন করে রবীন্দ্রনাথের নোবল প্রাইজের গৌরবও তার মনে জোগাল ভারতের গৌরবের ধ্যান? দায়ী কেউ নয়—তখন অগ্নিযুগ, আগুনের আঁচ তার বাতাসে।

বারোর পথে এগোতে এগোতে সেই আগুনের একেবারে মুখোমুখি এসে পড়লাম। লাঠি খেলা তার অনেক আগেই বন্ধ; ন্যাশনাল স্কুল তখন কার্যত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত। ছাত্ররা অপেক্ষা করছে কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেলে সাধারণ স্কুলে আবার ভর্তি হবে। শহরের পূর্বপ্রান্তে একটা মস্ত বড় বাগানে সে সময়ে শীতের শেষে মহোৎসব হত। বাগানটা ষোগীদিয়ার হেমবাবুর। মহোৎসবের কাঠামোটা খাঁটি দিশি—মেলার মতোই তা অকৃত্রিম। এ কালের 'সর্বজনীন' এ কালের মতো করে ডিমোক্র্যাটিক হয়েছে। কিন্তু মেলা-মহোৎসব প্রভৃতি হচ্ছে দেশের মতো করেই ডিমোক্র্যাটিক। যাক গে। দু-একজন স্বদেশী ভাবনার মানুষ ওই মহোৎসবের উদ্যোক্তা। তাঁরা ওই দিশির গায়ে কালের ছোপও লাগালেন। উৎসবটা 'শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব'। ব্যাপারটা সমস্ত শহরের। সাধারণে চাঁদা দেয়; নানা কথকতা, পুঁথিপাঠ বক্তৃতা হয়; আর একদিন খিচুড়ী-লাব্‌ড়ার প্রসাদ নেয় হাজারে হাজারে ছোটবড়ো ছত্রিশ জাতের মানুষ। অন্তত সাত দিন ধরে চলত ভাগবত পাঠ, গীতার ব্যাখ্যা, ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা, আর মাঝে মাঝে কোনো শৌখীন দলের যাত্রাগান, নিমাই সন্ন্যাসের মতো পালা-কীর্তন। সেখানেই প্রথম কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের ভাগবতের কথকতা শুনে আমি মুগ্ধ ও চমৎকৃত হই। সে আসরে মল্লিক মহাশয়ের সমাদরও ছিল—উদ্যোক্তাদের অর্থের জোগান ছিল কিন্তু কম। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘদেহ, দীর্ঘকেশ, মধুরকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় শ্রীধর স্বামীর টীকা উদ্ধৃত করে যখন গীতার ব্যাখ্যা করতেন, কিম্বা গান ধরতেন, তখন মুগ্ধ হতাম। অনেক দিন পর্যন্ত সে রেশ কানে ছিল—মনেও। এই শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবেই আসত বিক্রীর জন্য বাঙলায় প্রকাশিত বিবেকানন্দের নানা বক্তৃতা ও লেখা। নটেশন-এর প্রকাশিত ইংরেজিতে বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও লেখা স্থায়ী হয়েছিল বাবার

আলমিরাতে। বোধহয় দাদাই তারও উদ্যোক্তা,—এখনো তা আমার উত্তরাধিকারে। কিন্তু বক্তৃতার কথা উঠলে বাবা বলতেন, "কেশববাবুই ইংরেজি বাগ্মিতায় অদ্বিতীয়।"—তাঁর বক্তৃতার বইও আলমিরাতেই ছিল। মন কিন্তু ওই কথাটা মানতে চাইত না। হিন্দুপুনরুজ্জীবনের 'হেরো' যে বিবেকানন্দ। আর সে যুগটা বাঙলা দেশে Hero as the Orator-এর যুগ। বিবেকানন্দকে তাই অদ্বিতীয় বাগ্মীও প্রমাণ করা দরকার—বিশেষত ইংরেজিতে। অথচ ইংরেজির রস-বিচার তখনো আমাদের অসাধ্য। নটেশন্-এর প্রকাশিত গ্রন্থটার পাতা উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে রেখে দিতাম। এমন সময় এসে গেল বিক্রীর জন্য উদ্বোধনের প্রকাশিত বিবেকানন্দের বই, বক্তৃতা, লেখা, চিঠিপত্র, ডায়ারি। বইগুলি বাঙলায়। কিছু যে অনুবাদ তাও জানতাম; কিন্তু ভাবটা মাতৃভাষাতেই সহজে ধরতে পারি। চলতি বাঙলার লেখাগুলো পড়ে চমকিত হই। স্টাইলের সম্পূর্ণ মূল্য বুঝবার মতো বিচারশক্তি তখনো জন্মে নি; কিন্তু বোধশক্তির উন্মেষ হয়েছে। তাই অনুভব করছিলাম কোনো কোনো লেখার ও বক্তৃতার ভাষা আড়ষ্ট, কৃত্রিম; আবার কোনো কোনো লেখা—'সাধু বাঙলা' না হলেও—পৌরুষময়। একটা কথা এখন ভাবছি—বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে তো অনেক ভাষায় গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হবে। কিন্তু বাঙলা সংস্করণে কি উল্লেখ থাকবে কোন্‌টি স্বামীজীর মৌলিক রচনা, কোন্‌টি অপরের অনুবাদ? পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও মনে হয়েছে কোনো কোনো অনুবাদ বড়োই আড়ষ্ট; সে সবের পুনরনুবাদ করানোই কি উচিত নয়? অনুবাদও একটা বিজ্ঞান। যুগে যুগে নতুন করে তা করতে হয়; চেষ্টার পর চেষ্টায় তা মূলের তুল্য হয়, নিকট থেকে নিকটতর হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য মূল লেখারও, ইংরেজি বাঙলা যাই হোক—টীকাসুদ্ধ সম্পাদন করা প্রয়োজন। যাই হোক্, সেই বারো বৎসর বয়সে বাঙলা লেখার মধ্য দিয়েই প্রথম পেলাম বিবেকানন্দের স্পর্শ—আগুনের পরশমণি।

'আগুন' ছাড়া ও-মানুষের অন্য কোনো তুলনা নেই। তাঁর লেখার বা কথার সম্বন্ধেও না। সব লেখা আমি পড়ি নি। 'রাজযোগ', 'জ্ঞানযোগ' প্রভৃতি বইগুলো তখন ভয়ে ভক্তিতে পড়তে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। যা তখন পড়েছি আর বুঝেছি, আজ তা-ই সকলের মুখে, দেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। অর্থাৎ তখনো মিথ্যা বুঝিনি তাঁকে। আমরা দেখেছিলাম—যা মিসেস বেসান্ট বলেছেন—বিবেকানন্দের দুর্জয় যোদ্ধরূপ। বীর্যবান্ স্বাদেশিকতার ও

নব্যহিন্দুত্বের উন্মাদনার উৎস। আমাদের জীবনে পরেকার দশ বছর এই বীর সেনাপতিরই রাজত্বকাল। এ রাজত্ব আমার ওপরে একছত্র রাজত্ব হতে গিয়েও হয়ে ওঠে নি, আবার একেবারে বিলুপ্ত হয় নি,—এখনো না। বাঙলা দেশে যাকে অগ্নিযুগ বলে তার অগ্নিমন্ত্র কেউ যদি জুগিয়ে থাকেন তবে সে বিবেকানন্দ। সে যুগের অসম্পূর্ণতা অনেক—আমাদের জীবনের ও আয়োজনের মধ্যেই তার প্রমাণ পুঞ্জিত। তথাপি সে যুগের যা দান তা অতুলনীয়। আর সে দান বহুলাংশে বিবেকানন্দের দান: ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা, আক্ষুদ্র ভারতের জনসাধারণের জন্য মমতা, নির্ভীকতা সংযম ও ত্যাগের মূল্যবোধ। তখনকার দিনে আমরা যে-বিবেকানন্দকে পেয়েছি তিনি নিবেদিতার বিবেকানন্দ, পরে রলাঁ তাঁকে কালের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্থাপিত করে দেখান। আমরা সেদিনে ভাবতাম সেই বিবেকানন্দই বেলুড় মঠে ও রামকৃষ্ণ মিশনেও রূপায়িত হচ্ছেন। তাই ওদুই প্রতিষ্ঠানও আমাদের চোখে ছিল দুই আদর্শ প্রতিষ্ঠান। চাইতাম মিশনের লোকদের কাছে সেবাধর্মের শিক্ষানবিশী, কর্মযোগের দীক্ষা—তারপর কেউ না হয় নেবে জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে সাধনার পথ; কিন্তু অধিকাংশেই নেবে স্বদেশীর বীর্যবান ধর্ম—এই ছিল আমাদের তখনকার ধারণা। এ ধারণার জন্য অবশ্য সেই মঠ-মিশনের লোকেরা দায়ী নন। দায়ী বিবেকানন্দ স্বয়ং, দায়ী তাঁর লেখা কথা, দায়ী তাঁর তৈরি-করা মানুষ নিবেদিতা।

কথাটা এ প্রসঙ্গেই শেষ করে ফেলা যাক:—প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে একাধিক ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে স্বদেশী ভাবের যুবকেরা সেবায়োজনে শিক্ষানবিশী করে—বর্ধমানের প্লাবনে, বাঁকুড়ার নোয়াখালির দুর্ভিক্ষে। তাদের লক্ষ্য কিন্তু স্বদেশসেবা। লর্ড রোনাল্ডশে তাই বললেন, 'স্বদেশীরা' রামকৃষ্ণ মিশনের আবরণে গা-ঢাকা দিয়ে চলে। মিশনের তখনকার প্রেসিডেন্ট তৎক্ষণাৎ এ কথার প্রতিবাদ করে জানালেন—মিশন ধর্মসাধনার প্রতিষ্ঠান, রাজনীতি তার অস্পৃশ্য। তাঁর কথা সম্পূর্ণ সত্য। তবে আমরা তা বুঝতাম না। জানতাম না যে, ওজন্যই বিবেকানন্দের বিদায়ের পনের দিনের মধ্যেই নিবেদিতাকেও মিশনের সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়। স্বদেশীদের মনে তখনো মিশন-মঠই body of Vivekananda. তারপর, ১৯২১ থেকে আর্তসেবার কাজ কংগ্রেস সংগঠন ও কংগ্রেস কর্মীরা হাতে তুলে নিলেন। সেবাধর্মে মিশনের স্থান গৌণ হয়ে পড়ে; মিশনের তাগিদও কমে আসে। তখন থেকে

বিবেকানন্দের রাজত্বও স্বদেশীদের সমাজে স্তিমিত হতে থাকে। ১৯৩০-এর পর থেকে সেই মঠ-মিশন আর বাংলা দেশের প্রাণচঞ্চল যুবকদের আকর্ষণ করল না। দোষটা সবই যুবকদের নয়, ফলটাও কারো পক্ষেই সম্পূর্ণ শুভদায়ক হয় নি। অবশ্য দ্বিতীয় বিবেকানন্দের রাজত্বও দেখা দিয়েছে—১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পরে। তবে তা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের রাজত্ব বা মঠ-রাজত্ব। এ চার্চে আত্মত্যাগী পরিচালক আছেন, স্বার্থত্যাগী ভক্ত আছেন, সুশিক্ষিত সাধক সন্ন্যাসীও আছেন। আর বিত্তবান্ কীর্তিমান, এমনকি, বিদ্বান্, গৃহিণীদের ভীড়ে আজ রামকৃষ্ণ মিশনের জয়জয়কার। ঠাঁই নেই 'দরিদ্র নারায়ণের'। অচলায়তনে শোণিতপাংশু অদৃশ্য। মঠ-মনেস্টারি মাত্রেরই পরিণতি কি অচলায়তন?

কর্মযোগের রূপ

শিবের গাজন গেয়ে ফেললাম। ধানভানা বাদ দিতে চাই না। বিবেকানন্দের বাঙলা বই বাবাকে বা দাদাকে আকর্ষণ করে নি। তা বাড়িতে পাই নি। পেয়েছি বন্ধুবান্ধব সহপাঠীদের থেকে। আসলে পেয়েছিলাম একজনার কাছে। সে যজ্ঞেশ্বর দত্ত। বাদামতলারই বাসিন্দা, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে নয়। ওঁর দাদারা দু পা সরে এসে ঠিক বাদামতলায় তাঁদের দোকান খুলেছেন—সোনারূপার অলঙ্কারের কারখানা ও দোকান। কাছাকাছি তিনটি স্বর্ণকারের দোকান-কারখানার মধ্যে এটি মাঝারি। এরা নতুন মাথা জাগিয়েছেন, মাথা উপরে তুলতেও দৃঢ় সংকল্প। আমাদের বৈঠকখানার দিকে নিকটতম প্রতিবেশী এরা—এদের বাসাবাড়ি, দোকান, কারখানা। আগে পুকুরের এই পশ্চিমপাড়টা জুড়ে থাকতেন পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা কেউ কেউ। সে প্রায় অতীত ইতিহাস। আমার বাল্যে কৈশোরে যজ্ঞেশ্বররাই হ'ল তার বাসিন্দা। এরা জাতিতে কর্মকার, ব্যবসায়ে স্বর্ণকার, পরে মনোহারী দোকানদারও হন। এরাও সকলে সেই ঢাকা-বিক্রমপুরের ঔপনিবেশিক! এখন শুনলে কি নতুন শোনাবে, তখন পর্যন্ত এসব জাতের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যদের তফাৎটা আরও বেশি ছিল? একালের শিক্ষাও ব্যাপ্ত হয় নি, কিন্তু হতে শুরু করেছে। আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীতেই তাই সব জাতের মানুষ ছিলেন—যাদের 'জলচল নেই' তেমনও ছিলেন কেউ কেউ সাহা, যুগী, ধোপা ইত্যাদি। আমাদের বাড়িতে মা-জেঠাইমাদের কাছে তাদের বরাবরই 'জলচল'—কিন্তু সে অন্য কথা।

এ প্রসঙ্গে শুধু আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছি—প্রতিবেশীরূপে আমি নিকট থেকে দেখতে পেয়েছিলাম—বাল্যে কৈশোরে বাদামতলার ওই 'কামার-বাড়ির' মেয়ে-পুরুষদের; যৌবনে কলকাতায় কিছুদিন একটি অবস্থাপন্ন মুসলমান পরিবারকে; আর পরিণত বয়সে মানিকতলা শুঁড়িপাড়ার বাসিন্দাদের। অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি—এদের জীবনযাত্রায়, আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে আচরণে দেখেছি অসামান্য আন্তরিকতা ও সদাচার। বিশেষত এই কথা সত্য আবার ওই তিন জাতের তিন পরিবারের মেয়েদের সম্বন্ধে! যজ্ঞেশ্বরদের কাজেকর্মে, কথাবার্তায়, ব্যবহারে দেখেছি কর্মব্যস্ত সুসংযত ভাব, শিষ্ট স্বভাব ভদ্র আচরণ। যখন-তখন তাঁদের অন্দর মহলেও গিয়েছি, উচ্চকণ্ঠ কারও শুনিনি। ঘর দুয়ার পরিচ্ছন্ন নিকানো-পুছানো। বাড়িতে লোক অনেক। নিজেরা আছে, জ্ঞাতিকুটুম্ব, কারিগর—দোকানে কাজ করে, বাড়িতে খায়। সে যেন ভারতীয় 'গিল্ড' বিশেষ। মেয়েদেরও পরিশ্রমেই সংসারটাকে চালাতে হয়। নিশ্চয়ই সংসারের চাকায় সর্বদা প্রচুর তেল জোটে নি; কিন্তু কখনো কর্কশ আর্তনাদ শোনা যায় না। ভেতরে-ভেতর এঁদেরও ঠোকাঠুকি হয়তো হত, সব সংসারে যেমন হয়—কিন্তু বাইরে তার কাংস্যধ্বনি পৌঁছয় না। এই তো যথার্থ ভদ্র সংসার।

যজ্ঞেশ্বর অবশ্য বেশি সময়েই থাকত বাইরের একটা ছোট ঘরে। একপাশে চাউলের গোলা—চাউল 'রাখী' করে দাদারা বাজারে বিক্রী করেন,—আর পাশে ছোট তক্তপোষ, আর চৌকি ও প্যাকিং বাক্সের কাঠের টেবল তাক্,—এই যজ্ঞেশ্বরের আস্তানা। অদূরেই কারখানা কাম্ দোকান, সকাল থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত চলছে ঠুক-ঠাক্। তার একদিকে লম্বা গুটি কয় তক্তাপোষ, পাটি পাতা, স্তূপীকৃত কাঁথা-কাপড়ের গুটানো বিছানা। কারিগররা রাত্রিতে ঘুমোয়, দিনে বিশ্রাম করে, তাস পাশা খেলে। ভেতর বাড়িতে একপাশে ওদের ছোট ঠাকুর-ঘর আছে—সন্ধ্যার পরে তাতে কীর্তন চলে। বাইরে থেকেও দু-চারজন উৎসাহী আত্মীয় বন্ধু তাতে জোটে। নাম কীর্তনে, হরির লুটের নাচে গানে, খোলে করতালে বাদামতলা গরম করে রাখে তারা। বৈঠকখানার মজলিসে পর্যন্ত বড়োদের মধ্যে মাঝে-মাঝে কথা হয়—"এবার একটু থাম্‌লে বাঁচি।" গান-বাজনা সম্বন্ধে আমার কান সামান্য। ওই 'নিতাই-গৌর, নিতাইগৌর' আমাকে আকর্ষণ করে নি—গীতরসেও না, ভক্তিরসেও না। অনেক বেশি আগ্রহ ছিল যজ্ঞেশ্বরদের কামারশালায় বসে কারিগরদের কাজ দেখায়। হাতের কারুকর্ম, নকসার সূক্ষ্মতা, চারুতা, এসবে ছিল দৃষ্টি মুগ্ধ। নানা গল্পও

সেখানে তাদের মুখে শুনতাম। ওখানেই কৈশোর না পেরুতেই দু ভাই দাবা খেলা শিখে ফেলি। সে নেশা তখন এমন পেয়েছিল যে পরীক্ষার উত্তোলিত খড়্গও তা বাধা পেত না। এই কারিগরদের সঙ্গে কথাবার্তায়, খেলতে খেলতে আমরা তাদের কাজে-ভরা জীবনের, সহজ সুখদুঃখ ধ্যান-ধারণারও মধ্যে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ লাভ করেছিলাম—অবশ্য সে তত্ত্ব তখনো অজ্ঞাত। ব্যাপারটা কিন্তু অনেকে সুনজরে দেখতেন না—পদস্থ ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে 'কামার দোকানে' কি করি কামারদের সঙ্গে? এখন বলতে পারি—আমার বাদামতলার ওটাও একটা বিশেষ অধ্যায়। স্থূলতা রূঢ়তা এই কারিগর শ্রেণীর মধ্যে থাকবার কথা, কিন্তু ওখানে তা প্রশ্রয় পেত না—একটি অশিষ্ট শব্দও আমি তাদের মুখে শুনেছি মনে পড়ে না। সহজ সহৃদয় মানুষ, লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না, কিন্তু পৃথিবীর নানা কথা জানতে উৎসুক। ১৯১৪ থেকে যুদ্ধকালীন বাঙলা দৈনিক তাঁরা রাখতেন, পড়তেন, কাজ করতে করতে পড়া শুনতেন। সাধারণ কেরানি ভদ্রলোকদের থেকে এসব খবরাখবরে এই 'অশিক্ষিত' কারিগর কর্মীদের ঔৎসুক্য কম ছিল না। যজ্ঞেশ্বর ছিল তাদের গৌরব স্থল—সে লেখাপড়া করছে। তার বন্ধুরাও স্নেহ, আদর ও সম্মানেরও পাত্র। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 'দুয়ার থেকে অদূরে' দেখা এই কারিগর মিস্ত্রিদের স্মৃতিতে স্থূলতা কুশ্রীতার দাগ খুঁজে পাই না—একটা সহজ 'আটপৌরে' সদাচারের ছাপই তাতে দেখছি। আমার কাছে সত্যকার মেহনতি মানুষের এই প্রথম পরিচয়, এই প্রধান স্মৃতি—কর্মযোগের সহজ রূপ। ধান ভানতে গিয়েও তাই আবার এতটা কথা পাড়তে হল। আমার স্বদেশী-যোগের এও যে পটভূমি।

স্বদেশী-যোগ

যজ্ঞেশ্বর বাদামতলায় দাদাদের কাছে এসেছিল একটু বিলম্বে—তাঁরা যখন এখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। সে কনিষ্ঠ ভাই, তাকে তাঁরা পড়াশুনা করাবেন—তাঁদের উচ্চাশার এও একটা অংশ। সত্যই তাঁদের আশা সফল হয়েছিল—যজ্ঞেশ্বরের পড়াশুনায় মন ছিল। বি. এ. পাশ সে করে কৃতিত্বের সঙ্গেই, কিন্তু সে কথা এখানে নয়। বাল্যে সে পড়ত অন্যত্র এক আত্মীয় কারিগরের দোকানে থেকে—যতদূর বুঝেছি—সম্ভবতঃ স্বদেশী-যোগেই যুগীদিয়ার সে স্কুলেরও জন্ম। প্রকাশ্যে ন্যাশনাল স্কুল নয়, কিন্তু মনে মনে তাই। স্কুলের এই মন

বোধহয় যুগীদিয়ার জমিদার-গোষ্ঠীর মানুষ তার হেডমাষ্টার মশায়ের তৈরি। তাঁকে আমি দেখি নি, সে স্কুলও না। দেখেছি তার ছাত্র যজ্ঞেশ্বরকে ও মাঝে-মাঝে তার পূর্বতন সতীর্থদের—সে মন তারা কিছুটা বহন করে আনত, শহরে আমাদের গায়েও তার আঁচ দিয়ে যেত—সেখানকার পাঠ্যবিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যপদ্ধতির কথায় গল্পে। তাতে মনে হয়—স্কুলটার একটা আদর্শ ছিল। কতজন ছাত্র কি ভাবে জীবনে জেনে-না-জেনে তার বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে, কে তা বলবে ?

যজ্ঞেশ্বরের ছিল নানা সৎবিষয়ে উৎসাহ। আমার থেকে সে বছর তিন-চার বড়ো। এক ক্লাশ উপরে পড়ে, লেখাপড়ায় মনোযোগী, পূর্বপুরুষের কারুবিদ্যায়ও সে সুদক্ষ শিল্পী হতে পারত। ড্রয়িংএ হাত ছিল, লেখাও ছিল চমৎকার। দীপান্বিতায় বাজি তৈরি করা ছিল তাদের বাড়ির কারিগরদের একটা ঝোঁক। যজ্ঞেশ্বরেরও। একবার সেই বাজি তৈরি করতে গিয়েই তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল। অন্য চোখ সম্বন্ধেও তারপর সাবধান হতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবের বিক্রয়কেন্দ্র থেকে বিবেকানন্দের ও ওরকমের অন্য বই যজ্ঞেশ্বরের কাছে আসত। সে সংগ্রহ করত, সম্ভব হলে কিনত। আমরাও হতাম তার পাঠক। আমাদের বাড়ির বাবার আলমারির দুই একটা বইও চুরি করে তাকে পড়তে না দিতাম, এমন নয়। তাঁর নিভৃত চালাঘরে পড়বারও সুযোগ অব্যাহত। পড়ার মতোই আমাদের বাদামতলার খেলার ফাঁকে তা ছিল গল্পের জায়গা। সেই সূত্রেই পাই জিলা স্কুলের একটা ভালো ছাত্রগোষ্ঠীর পরিচয় ও বন্ধুত্ব—উপেন রায়, ইঞ্জিনীয়ার রাইমোহন ভৌমিক, ডাক্তার প্রাণকুমার কর প্রভৃতি ছিলেন যজ্ঞেশ্বরের সহপাঠী। 'গুণ্ডা ছেলের স্কুল' ও 'ভালো ছেলের স্কুলের' মধ্যেকার দূরত্বটা বাদামতলার ওই যজ্ঞেশ্বরের চালাঘরে এসে মিলিয়ে যেতে থাকে। সত্যই মিলিয়ে যায় অবশ্য ওই বিবেকানন্দের কর্মযোগের ও তার পরেকার স্বদেশী-যোগের যোগাযোগে।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও বিপ্লবায়োজন

কালের মন্দিরা তখন বামে বাজতে শুরু করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল (১৯১৪-১৯১৮)। বৈঠকখানার কান দিয়েই তার প্রথম খোঁজ পাই। ত্রিপলির যুদ্ধের রুশ-জাপান যুদ্ধের ছোপ তখনো বৈঠকখানার ছবিতে। ত্রিপলির যুদ্ধের সময়ে বাজারের মুসলমান দোকানিদের দোকানে তুর্কী যোদ্ধাদের মস্ত বড়ো

বড়ো রঙীন ছবি দেখতাম। মুসলমান ছাত্ররা দেখলাম একদিন লাল ফেজ-টুপি ছিঁড়ে ফেলল—তা নাকি ইতালির তৈরি। আর রুমের সোল্‌তান জেহাদ ঘোষণা করেছেন ইতালির বিরুদ্ধে। তারপর বল্‌কান্ যুদ্ধে শুন্‌লাম বুলগেরিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি কোনো কোনো দেশ তুর্কীর অধীনতা-পাশ ছেদন করে স্বাধীন হচ্ছে। নিশ্চয়ই তা উৎসাহের কথা। তবে তার ছাপও বৈঠকখানার গায়ে বেশি লাগল না। বাবার মুখে শুনতাম, "বড়ো রকমের যুদ্ধ একটা হবে জার্মানির সঙ্গে সম্ভবত ইংরেজের। অনেক দিন ধরে জার্মানি তৈরি হচ্ছে। সেই ১৮৭১-এ ফ্রান্সের গৌরব ধূলিসাৎ করে সে-ই হয়েছে ইউরোপ-ভূমির প্রধান শক্তি। বড়ো রকমের সাম্রাজ্য না পেলেই তার নয়।"

সেদিনটাও স্পষ্ট মনে আছে—৪ঠা আগস্ট, ১৯১৪। জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করল বেলজিয়মের স্বপক্ষে। আরম্ভ হল প্রথম মহাযুদ্ধ—আর তা শেষ হল ১৯১৮-র ১১ই নবেম্বর। চার বৎসর তো নয়, চারটা আজগুবি কাণ্ডের যুগ। কামানে-কামানে যুদ্ধ থেকে বিমানে-বিমানে যুদ্ধ। তারপর ট্যাঙ্কের পাল্লা। ক্রুজার-ব্যাটলশিপ্-এর সমুদ্রশাসন আর সাবমেরিন-টর্পেডোর গুপ্তাঘাত। গুজবেরও জোয়ার—এমডেন-এর কথা বলেছি। রাত্রে পথে দাঁড়িয়ে বয়স্করা গবেষণা করতেন আকাশে যা জ্বলছে তা কী? জেপলিন যে তা না বললেও চলে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কী? শুধু গুজব নয়। নিটশে ট্রিটস্কে প্রভৃতি নাম শুনলাম। বাবা প্রুশীয় জঙ্গীবাদ ও 'জার্মান কুল্‌টুর'-এর বিশ্বগ্রাসী হা আবিষ্কার করছেন নতুন বই থেকে। দাদা একবার নিয়ে এলেন নিটশে সম্বন্ধে চটি বই। ষোল আনা বোঝা অসম্ভব, কিন্তু সেই আবহাওয়ায় চার আনা কিম্বা ছ আনা বোঝা এই বারো-ছাপানো 'পাকা' ছেলের পক্ষে অসম্ভব হত না। ইংরেজি দৈনিক পড়ছি বাড়িতে; বাঙলা দৈনিক যজ্ঞেশ্বরদের ওখানে। নতুন কথা, নতুন শব্দ, নতুন আবিষ্কার, নতুন ধারণারও সঙ্গে পরিচয় প্রতি প্রভাতে। সুরেন্দ্রনাথ-তিলকের জোড়ালাগা কংগ্রেসও কি কম আশার উৎসাহের জিনিস? যুদ্ধের চমককে ছাপিয়ে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে কাছেকার ঘটনাও।—ওখানে স্বদেশী ডাকাতি, ওখানে বোমার আবির্ভাব, আর একখানে গোয়েন্দার স্বদেশীগুলিতে মৃত্যু। নির্মলকান্ত গুপ্তের মামলা নিয়ে আলোচনা সর্বত্র। বারবার জুরী বদলিয়েও হাইকোর্টের বিশেষ বিচারক এই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করাতে ব্যর্থ। সকলের মুখে ক্ষোভ, এ কি বিচারের প্রহসন। তার ওপরে

মুসলমানপাড়া বোমার মামলায় আসামী হয়ে পড়ল একেবারে আমাদের ঘরের পাশের ছেলে।—আমার বন্ধু উপেন সেনের দাদা সেনপাড়ার নগেন সেন। নগেন প্রেসিডেন্সির ছাত্র। রূপেগুণে সেনপাড়ার মধ্যমণি—সকলেই অবশ্য বরাবর জানত নগেন অসামান্য। বোমার কথা শুনে বুঝল—নগেনের তা অসাধ্য নয় কিন্তু তার দণ্ড হলে তা হবে সকলের দুর্ভাগ্য। মামলায় বেকসুর মুক্তি পেয়ে নগেন বিলাত চলে গেল। তারপরে যখন ফিরে এল (১৯২৩ ?) তখন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। সহৃদয়, কিন্তু বড় চাকুরে মাত্র। কিন্তু তার মামলা উপলক্ষ্য করে আবর্তিত হল শহর ; প্রবর্তিত হয়ে গেল দেশে প্রথম ভারতরক্ষা আইন। কারণ তার আগে—মুসলমান পাড়া বোমার মামলার পূর্বে পরে এখানে ওখানে স্বদেশীদের দুঃসাহসী কাজের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। দেশের সংবাদপত্রগুলি খবর ছাপছে ফলাও করে। মুখে অবশ্য তারাও করছে এইসব 'দুষ্কর্মের' নিন্দা। চারদিকে কিন্তু গোপনে গুঞ্জন 'সাধু! সাধু!' আর আরও চাপা একটা কর্ম-ব্যস্ততা। ছাই-চাপা আগুনের থেকে এক-এক ফুঁতে যেন আগুনের ফুলকি জ্বলে ওঠে রিভলবারের মুখে, বোমার দীপ্তিতে। আবার তখুনি ছাইচাপা দিয়ে তা ঢাকা হয়। শহরে দেখা যায় ছেলেদের শরীরচর্চার উৎসাহ দ্বিগুণ। দৌড়-ঝাঁপের প্রতিযোগিতায় পরম আগ্রহ। সেবা-শুশ্রূষার সংগঠন, আয়োজন অভিনব—বিবেকানন্দ যেন পাড়ায় পাড়ায় যুবকপ্রাণে জীবন্ত। আমাদের প্রতিবেশী যজ্ঞেশ্বরের ঘরে আবার তার একটা পীঠস্থান। কোথায় কলেরা, কোথায় টাইফয়েড তা যেন সেখানে যেসব ছাত্র আসে তার খোঁজ রাখা, শুশ্রূষা করা তাদেরই দায়। আসেও আবার অচেনা মুখ, তরুণ যুবক গ্রাম থেকে। সকলেই চাপা-চেতনায় উদ্দীপ্ত ; কী কাজ তাদের বোঝা যায় না—আর তাই বোঝা আরও সহজ। আমাকে কিন্তু একটু দূরে রাখবার চেষ্টা তাদের—অথচ আমার ভাই সাধু তাদের অন্তরঙ্গ। চাপা কথা, চাপা উত্তেজনা, গোপন সক্রিয়তার মাঝ থেকে তাদের কাজ ও দেশের নানা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক আবিষ্কার আমার পক্ষে দুঃসাধ্য নয়। কোনো কোনো বিষয়ে আমার দৃষ্টি তো বরাবরই তীক্ষ্ণ। শুধু বাঙলা নয়, বারাণসীর ষড়যন্ত্র মামলার শচীন সান্যাল, পিঙ্গলেদের কাজ আমার সুপরিচিত। পাঞ্জাবের গুরুমুখ সিংহ, ভাই পরামানন্দদের ছাড়িয়ে, আমেরিকার গদর দল, সানফ্রান্সিস্কোর বিপ্লবী চক্র, জার্মানির সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত বিপ্লবী চক্রের কোনো কথা আমার চোখ এড়াত না। কলকাতার মোটের ডাকাতিগুলোর তথ্য

সংবাদপত্র থেকে আমার মুখস্ত। হেদোর মোড়ে সুরেশ ভট্টাচার্যকে সকালবেলা গুলি করে যারা পালিয়ে গেল তাদের নাম না বেরুলেও বিবরণটা আমার সম্পূর্ণ জানা। আমড়াতলার এক বাড়িতে কে প্রশ্ন করলে "কি হে, যতীন, তুমি এখানে ?" অমনি গুলিতে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আর সাইকেল করে বাড়ির সেই যুবকেরা পালিয়ে গেল। যাকে 'শিকারের' চেষ্টা সেই 'যতীন' আর হেদোর সেই পলাতকরা একসঙ্গে অবশ্য আবিষ্কৃত হলেন পরে বালেশ্বরে একেবারে বুড়ী-বালামের তীরে 'বাঘা যতীন', চিত্তপ্রিয় প্রভৃতি রূপে। কিন্তু তার পূর্বেই সাইকেল ভাড়া করে এনে সাইকেল শিখল যজ্ঞেশ্বর, সাধু প্রভৃতি। ছোট বলে আমাকেও আর দূরে রাখা কি সম্ভব ? ম্যাৎসিনি-গ্যারিবলডীর জীবনী ও সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা', অক্ষয় মৈত্রেয়ের 'সিরাজদ্দৌলা', এসব আমাকে একেবারে ফাঁকি দিয়ে পড়াও যায় না, চালাচাল করাও অসম্ভব। আমারও উত্তেজনাটা চাপা থাকে না—শরীরে আমি সামান্য বলে সকলেরই বিশ্বাস। কথাটা মিথ্যা নয়। তা অপ্রমাণিত করবার জেদ আমাকেও করেছে শহরের দুরন্ত ছেলে, দেহের কষ্টে বা মনের সাহসে বাড়াবাড়ি করতে অকুণ্ঠিত। শিশু বয়স থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এই বর্ণচোরা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থেকে মুক্ত হতে পারি নি। যে কাজেই আমি অপটু বলে লোকের সন্দেহ, তাতেই আমি এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। 'কী মনে করে ওরা ?—দেশকে আমি ভালোবাসি না ? না স্বদেশীতে আমার সাহস নেই ?'—এই সংশয় সেদিনের তেরো বছরের পক্ষে বড়ো অসহনীয় চ্যালেঞ্জ। আজ হলে অবশ্য মনোবিজ্ঞানীদের দয়ায় সহজেই বলতে পারি—এই অভিমানটাই তো প্রমাণ যে, অনেকটা জোর করেই কায়িক অতি-প্রয়াস ও মানসিক অতি-সাহসে নিজের অভাবই আমি ঢাকা দিচ্ছিলাম। সেদিন তো মনোবিজ্ঞান জানতাম না। মানতামও না। স্থির হলাম, যখন অভিমানটা সম্পূর্ণ শান্ত হল—যজ্ঞেশ্বর আমাকে অচিরেই সমিতির স্থানীয় নেতার নিকটে নিয়ে গেল। না বললেও তাঁকে জানতাম। তিনি নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়—তখন তিনি আমাদের ইস্কুলের মাস্টারও। আর তাঁদের কথার শেষে বুঝলাম—দ্বিধা ছিল কোথায়—"বয়সটা চৌদ্দও নয়"। কিন্তু চৌদ্দ কি সকলেই ছিল—ছিল রাজপুত বালক বীর বাদল ? দুদিন পরেই তো আমি হব চৌদ্দ। বাঙালী বাদলকে তেরোর পরেই তাই দলভুক্ত করা হয়।

(ক্রমশঃ)

অমলেন্দু বসু

শেক্‌স্‌পিয়রের কাল

দেশ ও কাল দুই-ই যেন সযত্নে বেছে নিয়ে শেক্‌স্‌পিয়র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেশ—ইংল্যাণ্ড। ইওরোপ মহাদেশের অন্তর্গত একটি দেশ অথচ কুড়ি মাইল চওড়া সমুদ্রের বেড়া দিয়ে মহাদেশটির অন্য সব দেশ থেকে স্বতন্ত্র-করা। কাল—ষোল শতকের শেষার্ধ। তখন বিখ্যাত রেনেসাঁস-উন্মাদনা ইটালীতে ও ফ্রান্সে স্থবির হয়ে গেছে, সে সব দেশে ইতিহাসের নতুন পর্যায় শুরু হবে, ইংল্যাণ্ডে রেনেসাঁস এল বিলম্বে কিন্তু বিলম্বের দরুন তার প্রাবল্য কম হল না, এবং ইটালী, ফ্রান্স ও স্পেনে রেনেসাঁসের ফলে যে সব বাড়াবাড়ি দেখা গিয়েছিল ইংল্যাণ্ডে তার স্থান ছিল না, ইংল্যাণ্ডে বরং সংযম ছিল এবং পূর্বসূরীর অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ আচরণ ছিল।

আজকের গ্রেট ব্রিটেন তখন ছিল না। ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্‌ তিন দেশ মিলে আজ এক দেশ, যদিও মাঝে মাঝে স্কটল্যাণ্ডের ও ওয়েল্‌সের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় কিছু কিছু লোকের ঘোর আপত্তি শোনা যায়। কিন্তু ষোল শতকে ইংরেজ, ওয়েল্‌স্‌ম্যান ও স্কটস্‌ম্যান—তিনে খুবই সচেতন প্রভেদ বিদ্যমান ছিল, আচারে, ব্যবহারে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে। এই স্বতন্ত্র ইংল্যাণ্ডের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত শেক্‌স্‌পিয়রের জেলা, ওয়র্‌উইক্‌শায়ার, চারিদিকে প্রায় সমানসংখ্যক অন্যান্য জেলা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ওয়র্‌উইক্‌শায়ারের লোক যেন হাত বাড়িয়ে সমগ্র দেশের আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে সহজেই সংযুক্ত। যে হিসাবে ডিভনশায়ারের অথবা কর্নোয়ালের অধিবাসী, কাম্বারল্যাণ্ডের অথবা নরফোকের অধিবাসী, এমন কি লণ্ডনের প্রতিবেশী কেণ্টের অধিবাসীও অল্পবিস্তর আঞ্চলিক মনোবৃত্তির প্রতীক, অর্থাৎ তাঁদের কথার টানে পরিচ্ছদে খাদ্যরীতিতে এবং প্রাকৃত জীবনের অন্যান্য সূচীতে এমন একান্ত সঙ্কীর্ণ অঞ্চল-সীমিত রূপ যে সেকালে মনে হতে পারত যে দেশের সমগ্র সাংস্কৃতিক রূপ হয়তো এদের মর্মে প্রবেশ করে নি। ওয়রউইকের লোক

এই অর্থে কখনই অঞ্চল-সীমিত ছিল না। শেক্‌স্‌পিয়রের কালে এই ওয়রউইকের লোক অতি সহজেই মিশে যেতে পারত অন্য অঞ্চলের লোকের সঙ্গে। পশ্চিমে উরস্টার ও শ্রপ্‌শায়ার, দক্ষিণে গ্লস্টার অক্‌স্‌ফোর্ড বার্কশায়ার, দক্ষিণ-পূর্বে লণ্ডন-অঞ্চল, পূর্বে কেম্‌ব্রিজ-অঞ্চলের সেকালে কুখ্যাত জলাভূমিগুলি, উত্তরে নটিংহ্যাম ডার্বি ইয়র্ক—সব অঞ্চলের সঙ্গেই একটা সহজ সমতা বোধ করত ওয়রউইকের লোক। এই ওয়রউইকের অধিবাসী এবং শেক্‌স্‌পিয়রের সমকালীন ছিলেন কবি মাইকেল ড্রেটন যাঁর কাব্যে ইংরেজ স্বাজাতিকতা রূপ পরিগ্রহণ করেছে। ইংল্যাণ্ডের এই হৃৎপিণ্ড থেকে, ওয়রউইক্‌শায়ার থেকে, উৎসারিত হয়েছে অঞ্চলোত্তর সমগ্র ভূখণ্ডস্পর্শী একটা প্রশস্তহৃদয় স্বদেশপ্রেম, আর এই নবজাগ্রত ন্যাশনালিজমের অবিস্মরণীয় উদ্‌গাতা শেক্‌স্‌পিয়র যাঁর রচনায় ইংরেজরা বিশেষ মহকুমার অধিবাসী বলে চিহ্নিত হয় না, তাদের পরিচয় তাদের ইংরেজত্বে।

Now all the youth of England are on fire,
And silken dalliance in the wardrobe lies.

(Henry V)

And you, good yeomen,
Whose limbs were made in England, show us here
The mettle of your pasture ; let us swear
That you are worth your breeding : which I doubt not ;
For there is none of you so mean and base,
That hath not noble lustre in your eyes.

(Henry V)

This England never did ; nor never shall,
Lie at the proud foot of a conqueror.

(King John)

This royal throne of kings, this scepter'd isle,
This earth of majesty, this seat of Mars,
This other Eden, demi-Paradise ;
This fortress built by Nature for herself
Against infection and the hand of war ;

This happy breed of men, this little world ;
This precious stone set in the silver sea,
Which serves it in the office of a wall,
Or as a moat defensive to a house,
Against the envy of less happier lands ;
This blessed plot, this earth, this realm, this England,
This nurse, this teeming womb of royal kings,

* * *

This land of such dear souls, this dear dear land,
Dear for her reputation through the world.

(*Richard II*)

সর্বশেষ-উধৃত স্তবকে শেক্স্‌পিয়র যেন তাঁর নাটকীয় প্রথার নৈর্ব্যক্তিকতা বর্জন করেছেন, কুশীলবের মুখে যেন নিজেরই কথা বসিয়ে দিয়েছেন। যেন ভুলে গেছেন নাটকের প্রয়োজন, যেন নিজেই দাঁড়িয়েছেন মহাকালের রঙ্গমঞ্চে, দাঁড়িয়ে তাকিয়েছেন মহাকালের চিরন্তন দর্শক-শ্রোতাদের পানে, তাঁদের বলেছেন কী মধুর মহান তাঁর স্বদেশ ইংল্যাণ্ড! তাঁর স্বাজাতিকতায় বিধৃত হয়েছে ভৌগোলিক ইংল্যাণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, মিড্‌ল্‌সেক্স বা রাটল্যাণ্ডের মতো ক্ষুদ্র জেলা, আবার নরফোক্ ও ইয়র্কের মতো বিস্তীর্ণ জেলা।

শেক্স্‌পিয়রের এই সর্বধাত্রী সর্বসম্পর্শী দেশাত্মবোধ, একজাতিচেতনা, ইংরেজ ইতিহাসে নতুন। ইতিপূর্বে একজাতিচেতনা ছিল না, ছিল ফিউড্যাল-যুগের সামন্ততান্ত্রিক কৌমনিষ্ঠা, যার ব্যঙ্গাত্মক স্থষ্ঠু বর্ণনা পাওয়া যায় বার্নার্ড শ'র 'সেইণ্ট্ জোন্' নাটকের এক উক্তিতে :

A Frenchman! Where did you pick up that expression? Are these Burgundians and Bretons and Picards and Gascons beginning to call themselves Frenchmen, just as our fellows are beginning to call themselves Englishmen?···If this cant of serving their country once takes hold of them, goodbye to the authority of their feudal lords, and goodbye to the authority of the Church.

শ'র কল্পিত উক্তির ঐতিহাসিক কাল ১৪২৯ খৃষ্টাব্দ, শেক্স্‌পিয়র-উধৃতিগুলির রচনাকাল থেকে ১৫০ বৎসর পূর্বে। এই দেড় শতক কালের মধ্যে টেম্‌স্ নদীতে অবশ্যই কয়েক লক্ষ কুসেক্ জল প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু তারও বড়ো এমন এক বন্যা প্রবাহিত হয়েছে যার ফলে সংকীর্ণ গোষ্ঠী-মনোভাব পরিবর্তিত ও পরিশীলিত হয়েছে স্বাজাতিকতায়।

সেজন্যই বলেছি শেক্স্‌পিয়র যেন জন্মগ্রহণ করার পূর্বে দেশ ও কাল বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর কর্মের ও সিদ্ধির সঙ্গে কালের ও দেশের অনেক রকম সঙ্গতি বিদ্যমান, এত সঙ্গতি যে শুধু তাঁর জীবনী-আলোচনার প্রসঙ্গে ইতিহাস ও ব্যক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু অন্ধ আধিদৈবিক প্রত্যয় উদ্ভূত হতে পারে, মনে হতে পারে যে সবার উপরে ইতিহাস সত্য, তাহার উপরে নাই, ভাবা যেতে পারে যে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের বাহিরে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা বলে' কিছু নেই। আমার নিজ প্রত্যয় তেমন নয় কিন্তু শেক্স্‌পিয়র-আলোচনায় পরিবেশ ও ব্যক্তির অঙ্গাঙ্গী সালোক্য অবশ্য-লক্ষ্যণীয় বিষয়। টিউডর যুগের একজাতি প্রেমের মূলে কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিদ্যমান ছিল, প্লাণ্টাজেনেটদের রাজত্ব আর তারপরে ইয়র্ককুল ও লাঙ্কাস্টারকুলে রক্তাক্ত সংঘর্ষ কী ভাবে সর্বমান্য এক রাজতথ্‌তে (টিউডর রাজতথ্‌তে) শান্ত সমাহিত হল, কী ভাবে মধ্যযুগের শক্তিমান ব্যারনগণ ও বিশপগণ ক্ষমতাবঞ্চিত হলেন, কী ভাবে অনেক স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিরোধ ও অস্থিরতা পেরিয়ে, কতিপয় আন্তর্জাতিক বিপদের মহদাশঙ্কা অতিক্রম করে' রানী এলিজাবেথের শেষ পনেরো বৎসরে ইংল্যাণ্ড অভূতপূর্ব শান্তি সমৃদ্ধি সংহতি ভোগ করল, কী উপায়ে এই যুগেই আবার ভবিষ্যৎ সমাজ-বিবর্তনের মহান বীজ সুপ্ত ছিল, সে সব ঘটনাবলীর উল্লেখ বা আলোচনা এই সাময়িকী-প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে আসে না। আমি বরং ধরে নেব আমার পাঠক ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস সম্বন্ধে অন্ততঃ যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান রাখেন। আমার বিবেচ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাবে উদ্ভূত কোন্ কোন্ মূল চিন্তা ও প্রত্যয় শেক্স্‌পিয়রের রচনায় নিয়ত উপস্থিত। ইতিহাসের, বিশেষত রাজনৈতিক ইতিহাসের, পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাচ্ছি শেক্স্‌পিয়র এমন দেশে এমন কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন ও যেখানে স্বাজাতিকতার উদ্দীপনায় সর্বজনের চিত্ত ভরপূর ছিল, যখন ও যেখানে এই উদ্দীপনার সঙ্গে ইওরোপীয় রেনেসাঁসের শতবর্ষপুষ্ট নবচিন্তাধারা

সংমিশ্রিত হয়ে এক আশ্চর্য বাণীসৃষ্টির যুগ প্রস্তুত করল। শেকস্‌পিয়র এই কালের এই দেশের মানুষ, তার উপরে সেই ওয়রউইকের মানুষ যেখানে স্বাজাতিকতা যেন হাত বাড়িয়ে দ্বীপময় ছোট দেশটির চূর্ণতরঙ্গধৌত বেলাভূমি পর্যন্ত আপন করে নিত।

দুই

শেকস্‌পিয়রের স্বাজাতিকতা কিন্তু ঠিক পেট্রিয়টিজম্ নয়। পেট্রিয়টিজম্ এই স্বাজাতিকতার অবশ্যই অন্তর্গত কিন্তু আরও অনেক চিত্তবৃত্তি ও চিন্তা-প্রণালী সেই সঙ্গে বিধৃত। কবি-নাট্যকার হিসাবে এই টিউডর স্বাজাতিকতা থেকে যে শ্রেষ্ঠ প্রেরণা তিনি গ্রহণ করেছিলেন সে-প্রেরণা (আমার দৃঢ় বিশ্বাসে) তাঁর চিন্তা ও কল্পনাকে, তাঁর মনোলোকবাসী অনুভূতিগুলিকে তাঁর পরিচিত প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে সংযুক্ত রেখেছে। শেকস্‌পিয়রের কল্পজগৎ তাঁর সমকালীন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গম্য জগতের ভিত্তিতে নির্মিত। অর্থাৎ যে-জগৎ শেকস্‌পিয়রের শিল্পে প্রতিভাত; যে পরাক্রমশালী তুঙ্গ কল্পনা অগণিত নরনারীর কথায় আচরণে চিন্তায় আবেগে কর্মে সমূর্ত হয়েছে; যে-জগতের অধিবাসী একই স্বাধিকার দাবীতে শাইলক্ ও বুলিবটম্, হ্যামলেট ও ফলস্টাফ, ওফিলিয়া কর্ডিলিয়া ও ভলুমনিয়া, ক্লিওপাট্রা ও মিস্ট্রেস্ কুইক্‌লি, লিয়র ও টোবি বেল্‌চ্; যে-জগতে মানবিক অভিজ্ঞতার প্রায় সব কয়টি ভাবনা ও ক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছে, সেই জগতের শিকড় শেকস্‌পিয়রের পরিচিত প্রত্যক্ষ জগতেই নিহিত। বোধহয় শিল্পের ধর্মই এমন যে মহৎ শিল্প কখনই প্রত্যক্ষবিমুখ হতে পারে না, প্রত্যক্ষ থেকেই তার উদ্ভব যদিচ শিল্প ও প্রত্যক্ষ সমার্থ নয়। এমন যে দান্তের অপ্রাকৃত মরণোত্তর জগৎ, সেখানেও পাওলো ও ফ্রান্‌চেস্‌কা বাস করে, বাস করে বিয়াত্রিচে, উগোলিন, ব্রুনেত্তো, এবং আরও অনেক নরনারী যাদের দেখা দান্তে পেয়েছিলেন হয় ইতিহাসের পাতায় নয়তো ফ্লরেন্স নগরে নিজ গৃহের আশেপাশেই। মাইকেল এঞ্জেলোর মহান আদম মূর্তি মনগড়া নয়, সে-মূর্তির দেহাবয়ব কোনও সমকালীন মনুষ্যেরই দেহাবয়বের অনুরূপ যদিচ সে-মূর্তির গম্ভীর মহত্ত্ব শিল্পীর সৃজনী কল্পনা থেকে উৎসারিত।

শেকস্‌পিয়রের সৃজনীপ্রতিভা সম্বন্ধে আমরা কখনোই স্পষ্ট সমুচিত ধারণা করতে পারি না যদি না অহরহ এ-কথা স্মরণ রাখি যে

শেকস্‌পিয়রীয় কল্পজগৎ বায়ুভূত নিরালম্ব নিরাশ্রয় জগৎ নয়, সে-জগতের মূলে concrete reality বর্তমান, একটা বস্তুদৃঢ় প্রত্যক্ষ বর্তমান। শেকস্‌পিয়র ভালোবেসেছেন স্বকালকে, স্বদেশকে, সেই ভালোবাসা ভোঁয়াটে নয়, সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে সমকালীন ইংল্যাণ্ডের দৃশ্যসাধ্য, শ্রবণসাধ্য, স্পর্শ-ঘ্রাণসাধ্য রূপগুলিকে আত্মচেতনার নিরন্তর রসে সঞ্জীবিত করেছেন, করে' সেই প্রাকৃত অভিজ্ঞতাকে বাণীর বিদেহী চিরন্তন দ্যোতনায় রূপায়িত করেছেন। এই সদা-অমলিন প্রত্যক্ষতার জন্যই প্রধানতঃ শেকস্‌পিয়র সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত, ইংল্যাণ্ডে, ইওরোপে, এমন কি সাগর পারে আমাদের দেশেও, যেখানকার নৈসর্গিক জগৎ ইংল্যাণ্ডের নৈসর্গিক জগতের তুল্য নয়। তুল্য না হোক, শেকস্‌পিয়র-জগতের মূলে যে বস্তুময়তা তাতে সকল রকমের পাঠকের ও দর্শকের কল্পনা নির্ভরযোগ্য আশ্রয় পায়। এই প্রত্যক্ষজ্ঞান যাবতীয় মানুষে মানুষে অচ্ছেদ্য সংযোগসূত্র। বাংলাদেশের যে চাষী চাল ডাল উৎপাদন করে, তাকে আমেরিকার আরিজোনায় নিয়ে গেলে সেখানকার কৃষিপদ্ধতিতে সে আকৃষ্ট হবে যতই না সে-পদ্ধতি তার পরিচিত বঙ্গীয় পদ্ধতি থেকে পৃথক হোক। নিকোবর দ্বীপের তীরধনুকে সজ্জিত যোদ্ধা আফ্রিদির রাইফেল দেখে কৌতূহল বোধ করবে। আমার জগতে (আমার প্রত্যক্ষ জগতে আবার মনোজগতেও) এবং শেকস্‌পিয়রের জগতে অনেক বৈষম্য, অনেক প্রভেদ, কিন্তু আমার প্রত্যক্ষনির্ভর অনুভূতি তাঁর প্রত্যক্ষনির্ভর কল্পজগতে স্বস্তি পায়, প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে অগ্রসর হয়ে ক্রমে মনোজগতেও শেকস্‌পিয়রকে পায় (মোহিতলালের ভাষায়) 'আত্মার আত্মীয়'। এইভাবেই শেকস্‌পিয়র-সাহিত্যের ইউনিভার্সল্, সার্বজনিক আকিঞ্চন।

তিন

যে বস্তুময় প্রত্যক্ষজগতের অগণিত প্রকাশ শেকস্‌পিয়রের শিল্পরূপে তার কিছু ধারণা হওয়া দরকার।

এভন্ নদীর পাড়ে অবস্থিত ছোট স্ট্র্যাটফোর্ড শহরটির নাম আজ সমস্ত পৃথিবীতে সুপরিচিত, বেথলেহেম শহরের মতোই। পুরানো গ্রাম। নর্ম্যান বিজয়েরও পূর্বে থেকে এই গ্রামের ইতিবৃত্ত প্রায় নিরবচ্ছিন্ন এবং এই গ্রাম্য-শহরের আশেপাশে গ্রামগুলিতে ১৫-১৬ শতকে বেশ কয়েকটি শেকস্‌পিয়র

পরিবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের শেক্স্‌পিয়র যদি আজ ভূতলে ফিরে আসতেন তাহলে হয়তো স্ট্র্যাটফোর্ড এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে ঘুরে-ফিরে খুব কিছু বিস্মিত হতেন না কেননা মোটরগাড়ি, রেলরাস্তা ও ইতস্তত কয়েকটি কারখানার চিমনি ছাড়া খুব বিপর্যয়কারী দৃশ্য চারিদিকে বেশি মিলবে না। অবশ্য এই জেলারই এক অংশে, স্ট্র্যাটফোর্ড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরেই অবস্থিত বার্মিংহাম শহর, অন্যদিকে লীমিংটন শহরটিতেও কারখানার সংখ্যা বাড়ছে, আরও কিছুদূরে কভেন্ট্রি শহরের বুকে এখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমা-লাঞ্ছন লক্ষ্য করা যায়। এ-ও সত্য যে শেক্স্‌পিয়রের কালে ছোট শহরটিতে যত ফাঁকা জায়গা ছিল, যত মাঠ-ময়দান, গাছপালা ছিল এখন তত নেই কিন্তু সেকালের বড়ো রাস্তাগুলি—ব্রিজ স্ট্রীট, হেন্‌লি স্ট্রীট, হাই স্ট্রীট—এখনো তেমনি আছে, এখনো এভন্‌ নদীর উপরে ছোট পুলগুলি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, আর পুলের তলায় রাজহাঁসগুলি ভাসে, স্ট্র্যাটফোর্ডের গির্জা ও কবরখানা (যেখানে শেক্স্‌পিয়রের কবর) এখনো তেমনি গম্ভীর। শেক্স্‌পিয়রের যৌবনকালে শহরে এক হাজার এল্‌ম্‌ গাছ ছিল, বাড়িঘর ছিল মাত্র শ' ছয়েক, কিন্তু পাখি ছিল গাছে গাছে, সে সব পাখি গান গাইত বিচিত্র সঙ্গীতের ঐক্যতানে, কত রকমের ফুলই না শহরে এবং শহরের আশেপাশে দেখা যেত, আজও দেখা যায়। আমি একদা hitch-hiking করেছিলাম, অর্থাৎ ভ্রমণ করেছিলাম কিছুটা পদব্রজে কিছুটা দয়ালু অপরিচিত মোটরযাত্রীর কৃপায়, অক্সফোর্ড থেকে বিখ্যাত কট্‌সোল্ড পাহাড় পেরিয়ে, ফেল্‌ডনের মধ্য দিয়ে স্ট্র্যাটফোর্ড অবধি গিয়েছিলাম (যে রাস্তা দিয়ে শেক্স্‌পিয়র নিজে অক্সফোর্ড হয়ে লণ্ডনে যেতেন), পরে শেক্স্‌পিয়রের মামাবাড়ি উইল্‌ম্‌কোট ও শ্বশুরবাড়ি শটেরিতে ঘুরে-ফিরে বেড়িয়েছিলাম, তখন (মাসটা ছিল আগস্ট, "ফুলেরই দিন!") আমার অসংবেদী কুনো শহুরে-চোখেও ধরা পড়েছিল ওয়রউইকে ফল-ফুলের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র! এই সব ফুল-ফলের দেদীপ্যমান স্মৃতিই কি কিছু অমর ছত্রের জনক নয়? 'দি উইন্টার্স টেল'-এ পার্ডিটা বলছেন:

Reverend sirs,
For you there's rosemary and rue ; these keep
Seeming and savour all the winter long :

... ...
Sir, the year growing ancient,—
Not yet on summer's death, nor on the birth
Of trembling winter,—the fairest flowers o' the season
Are our carnations, and streakt gillyvors,
Which some call nature's bastards : of that kind
Our rustic garden's barren.

এই একটি দৃশ্যেই পার্ডিটা কত না ফুলের নাম করেছেন!

Here's flowers for you ;
Hot lavender, mints, savory, marjoram ;
The marigold···these are flowers
Of middle summer, and, I think, they are given
To men of middle age.

এর পরে পার্ডিটা সাজাচ্ছেন flowers o' the spring, বসন্তের ফুল—ড্যাফোডিল, ভায়োলেট, প্রিমরোজ (pale primroses), অক্স্‌লিপ্‌, ক্রাউন-ইম্পেরিয়ল, ফ্লাওয়ার-স্থ-ল্যুস্‌। পার্ডিটার এই প্রমোদোচ্ছল উক্তির বিপরীত উক্তি মনে পড়ে, ওফিলিয়ার বেদনাবিদ্ধ স্বগতোক্তি:

There's rosemary, that's for remembrance ; pray, love, remember : and there is pansies, that's for thoughts,···there's fennel for you, and columbines ; there's rue for you ; and here's some for me ; we may call it herb of grace o' Sundays. O ! you must wear your rue with a difference. There's a daisy ; I would give you some violets, but they withered all when my father died.

এসব উল্লেখে ও বর্ণনায় প্রত্যক্ষের উজ্জ্বল মোহর আঁকা। যিনি না দেখেছেন তাঁর পক্ষে এ বর্ণনা সম্ভব নয়, দেখেছেন আর ইন্দ্রিয়ের উদগ্র সংহত শক্তি দিয়ে দেখেছেন। এই ফুলের বর্ণনারই প্রসঙ্গে 'উইন্টার্স টেল্‌' নাটকে শেক্স্‌পিয়র অন্য এক প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন যা ষোল শতকী ইংল্যাণ্ডের গ্রাম্য অঞ্চলে সুপরিচিত ছিল—গান-পাগল ফিরিওয়ালার প্রসঙ্গ:

O master, if you did but hear the pedlar at the door, you

would never dance again after a tabor and pipe; no, the bag-pipe could not move you. He sings several tunes faster than you'll tell money; he utters them as he had eaten ballads, and all men's ears grew to his tunes··· He hath songs for man or woman of all sizes··· He has the prettiest love-songs for maids···with such delicate burdens of dildos and fadings, 'jump her and thump her'··· He hath ribbons of all the coiours i' th' rainbow···inkles, caddisses, cambrics, lawns. Why he sings 'em over as they were gods or goddesses.

(*The Winter's Tale*)

এই গ্রাম্য আমোদের অন্য প্রাসঙ্গিক উল্লেখ পাই অন্যত্র :

At Pentecost

When all our pageants of delight were played.

(*Two Gentlemen of Verona*)

মধ্য-ইংল্যাণ্ডে সে যুগে ফিরিওয়ালারা গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াত রকমারি গান গেয়ে, যেমন যেমন ক্রেতা তেমন তেমন গান গেয়ে। অতি তুচ্ছ বিষয় এটি, ইতিহাসের মহিমময় দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, কবির দৃষ্টিতেও তেমনটি পড়ে না—শেক্স্‌পিয়রের সমকালীন কিড্‌, মার্লো, স্পেন্সর্‌, ডান্‌, চ্যাপম্যান লক্ষ্য করেন নি এই তুচ্ছ ব্যক্তিটিকে—কিন্তু উইল্‌ শেক্স্‌পিয়রের সদা-সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়েছে কম জিনিসই, আর যা কিছুই তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান-সাধ্য হয়েছে তা-ই তিনি শিল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সত্যিকারের দেশাত্মবোধ এখানেই।

ফিরিওয়ালার গান অনেক সময় পাখির গানের অনুকরণ। শেক্স্‌পিয়র অজস্র পাখি দেখেছিলেন ও অসংখ্য পাখির গান শুনেছিলেন ওয়রউইক্‌শায়ারের নাতিশীতোষ্ণ বাতাবরণে বিশেষতঃ জেলার উত্তর অঞ্চলে, যে-অঞ্চলের নাম আর্ডেন সেই উপবনে। এভন্‌ নদীটি এই জেলাকে প্রায় দুটি সমান ভাগে ভাগ করেছে, উত্তর অঞ্চল হচ্ছে আর্ডেন বন, সেখানে লোক বসতি কম (শেক্স্‌পিয়রের কালে ছিল, আজও কম), গাছপালা বেশি, এই আর্ডেন বনই শেক্স্‌পিয়রের কল্পনায় রূপায়িত হয়েছে 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকের বিখ্যাত ফরেস্ট অব আর্ডেন-এ :

Are not these woods
More free from peril than the envious court?
Here feel we not the penalty of Adam,
The season's difference; as the icy fang
And churlish chiding of the winter's wind.

এই সেই দেশ যেখানে

সব ছেড়ে আমাদের মন
ধরা দিত যদি এই স্বপনের হাতে !
পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর,—
থাকিত না হৃদয়ের জরা—

এই সেই land of heart's desire, হৃদয়ের আকাঙ্খার দেশ, যেখানে

দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙ্খার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়—ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি—

শেক্স্‌পিয়র-যুগের সাহিত্যে বারংবার একটি সুর শুনতে পাই, কর্মময় প্রাণচঞ্চল ধাবমান জীবনের বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশের পাশে এক নিভৃতে একটি অনুচ্চ মৃদু সুর অনুরণিত হয়, সে সুরে প্রকাশ পায় কর্মে ক্লান্তি, নাগর জীবনে ঔদাস্য, জীবনের আম-দরবার ছেড়ে সঙ্গোপনে খাস-কামরায় চলা-ফেরা অথবা কিছু-না-করার নির্দায়িক সুখ ; public duty এবং private repose-এর তারতম্য-জ্ঞান। সমকালীন প্রায় সব নাট্যকারেই এই সুর শুনতে পাই, শেক্স্‌পিয়রের প্রায় প্রতিটি ট্র্যাজেডি ও ইতিহাস-নাটকে এই সুর ধ্বনিত, এই সুরই 'টেম্পেস্ট' নাটকে গন্‌জালোর ইউটোপিয়া-বর্ণনে, আর এই সুরের জালেই সে যুগের পাস্‌টরাল সাহিত্য আবদ্ধ। শেক্স্‌পিয়রের সেই স্বপ্নের দেশ কিন্তু নিতান্তই বায়ুভূত দেশ নয়, সে-দেশ প্রত্যক্ষে অনুষক্ত, সে-দেশ ওয়রউইক্‌শায়ারের আর্ডেন নামক নির্জন নিষ্কোলাহল নৈসর্গিক পরিবেশে অবস্থিত। শেক্স্‌পিয়রের যে সব নাটকে বন বা উপবনের বা গ্রামের পরিবেশ—অ্যাজ ইউ লাইক ইট, উইন্টার্স টেল, টেমিং অব্‌ দি শ্রু—সে সবের নৈসর্গিক বর্ণনা সযত্নে অধ্যয়ন করলে প্রত্যক্ষের দৃঢ় বস্তুময়তা

আমাদের অভিভূত করে। এই আর্ডেন-উপবনে এবং তৎনিকটবর্তী অঞ্চলে কোন্ সব পাখি ষোল শতকে দেখা যেত তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায় ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম টার্ণার দ্বারা লিখিত একটি পক্ষী বিবরণীতে, উইলিয়ম হ্যারিসনের পর্যটন-বৃত্তান্তে, লিল্যাণ্ডের ও পরে ক্যাম্‌ডেনের পুরাতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থগুলিতে। আশ্চর্যের বিষয় এ সব গ্রন্থে উল্লিখিত যাবতীয় পাখির নাম পাওয়া যায় শেকসপিয়র-রচনায়, এমন কি তারও বেশি। অধ্যাপক আনিয়ন্স বলছেন: If Shakespeare's predilection for any particular class of creatures can be inferred from the number of his allusions to them, the first place must be given to birds।

কত পাখি শেকসপিয়রে!—চড়াই, সোয়লো, কোকিল, পেঁচা (একাধিক শ্রেণীর পেঁচা), রেন্, ম্যালার্ড, স্নাইপ্, প্লভার, কোয়েইল, উড্‌কক্, তিতির, বন মুর্গী; হাঁস (অনেক শ্রেণীর), টার্কি, ময়ূর, শেল্‌ড্রেক, স্বপতাক, ড্যাবচিক, করমোরাণ্ট, ব্ল্যাক বার্ড, নাইটিঙ্গেল, থ্রাশ, লার্ক, রবিন রেডব্রেস্ট, কাক, দাঁড় কাক, ম্যাগপাই, চিল, জে, স্টার্লিং, ঈগল, শকুন, বাজপাখি, তোতাপাখি, উটপাখি। এখানে আমি চিড়িয়া শুমারি করতে বসিনি, মোট কত পাখি শেকসপিয়রে পাওয়া যায় তার তালিকা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, শুধু শেকসপিয়র-সাহিত্যের ভিত্তি কত প্রত্যক্ষ কত দৃঢ় বস্তুময় সে বিষয়ে ধারণা সৃষ্টির জন্যই কিছু নামের উল্লেখ করলাম, কোন্ পাখির নাম কোন্ নাটকে কোন্ প্রসঙ্গে পাওয়া যায় এত সব বিশদ আলোচনায় গেলাম না। আখেরি বিচারে যিনি যত যত্ন ও প্রেম সহকারে শেকসপিয়রের গ্রন্থাবলী পাঠ করেছেন তাঁর সংবেদনা ততই তথ্যপুষ্ট ও চিন্তা সমৃদ্ধ হবে। পাখি ছাড়া আরও প্রাণী আছে শেকসপিয়রে—মাছ ও জলজ প্রাণী (রুই, কড্, ডেস্, হেরিং, পাইক, ম্যাকেরেল্, মিনো, স্যামন্, স্প্রাট, টেন্‌চ্, ট্রাউট; মাসেল্, অয়স্টার, বড় চিংড়ি, কাঁকড়া, কুচো চিংড়ি; অ্যাঞ্চোভি, গার্নেট) তিমি, শুশুক,—সাপ, কেঁচো, কেন্নো, পোকামাকড়। জানোয়ার শেকসপিয়রে কত রকমের তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 'ম্যাকবেথ' থেকে যেখানে শুধু কুকুরেরই অনেক জাতির তালিকা দেওয়া হয়েছে:

Ay, in the catalogue ye go for men;
As hounds, and grey-hounds, mongrels, spaniels, curs,
Shoughs, water-rugs, and demi-wolves, are clept

All by the name of dogs: the valu'd file
Distinguishes the swift, the slow, the subtle,
The housekeeper, the hunter.

শেকসপিয়র ঠিক কোন বৎসরে স্ট্র্যাটফোর্ড ছেড়ে গিয়েছিলেন সে কথা আমরা জানিনে, তবে এমন মনে করা অসঙ্গত হবে না যে বিয়ের পরেও চার পাঁচ বৎসর অর্থাৎ তাঁর বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স অবধি তিনি স্ট্র্যাটফোর্ডেই ছিলেন। যতদিনই ছিলেন তিনি যেন সর্বেন্দ্রিয়ের উন্মুখ আত্মসাৎকরণী শক্তি দিয়ে চারিপাশের জগৎ লক্ষ্য করেছিলেন। সে-জগৎ যেমন নরনারীর জগৎ তেমনই পশু-পাখি গাছপালা পোকামাকড়ের জগৎ, যেমন চিন্তার ও ভাবের, লীলার ও আবেগের জগৎ, ঋতুর জগৎ, তেমনই বিচিত্র ধ্বনি ও বর্ণের জগৎ। অতএব এই জগৎ ব্যাপক বিচিত্র সর্বাত্মকৃত জগৎ। কিন্তু যেহেতু শেকসপিয়রের চিত্ত কেবল ইন্দ্রিয় নির্ভর ছিল না, মননশীলও ছিল, সেজন্য এই প্রত্যক্ষ জগতের বস্তুগুলির মধ্যে তিনি অনেক সময় প্রতীকী অর্থ খুঁজে পেতেন। সুতরাং এই জগৎ থেকে তাঁর অজস্র বাকপ্রতিমা, অসংখ্য রূপক উদ্ভূত হয়েছে। আমি মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি।

I can suck melancholy out of a song as a weasel sucks eggs.

(As You Like It)

You play the spaniel,
And think with wagging of your tongue to win me.

(Henry VIII)

The strain of man's bred out
Into baboon and monkey.

(Timon of Athens)

So work the honey-bees,
Creatures that by a rule in nature teach
The act of order to a peopled kingdom.
They have a king and officers of sorts;
Where some, like magistrates, correct at home,
Others, like merchants, venture trade abroad,

Others, like soldiers, armed in their stings,
Make boot upon the summer's velvet birds ;
Which pillage they with merry march bring home
To the tent-royal of their emperor :
Who, busied in his majesty, surveys
The singing masons building roofs of gold,
The civil citizens kneading up the honey,
The poor mechanic porters crowding in
Their heavy burdens at his narrow gate,
The sad-eyed justice, with his surly hum,
Delivering o'er to executors pale
The lazy yawning drone.

(Henry V)

চার

আমার অনুমান যে নিসর্গের প্রত্যক্ষ জ্ঞান শেক্‌স্‌পিয়রে সঞ্জাত হয়েছিল প্রধানতঃ স্ট্র্যাটফোর্ড-অন্‌-এভনের পরিবেশ থেকে। তাহলে রাজারাজড়া মন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চকোটিসম্ভূত নরনারীর চরিত্র ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এবং নাগরিক রাজধানী-সংস্কৃতির ধারণা তিনি অর্জন করেছিলেন তৎকালীন লণ্ডন থেকে। এসব বিষয়ে অনুমান কখনোই তথ্য-প্রমাণিত সত্য নয়, এসব উক্তিতে গোঁড়ামি চলে না, অতএব আমি 'প্রধানতঃ' শব্দটির প্রয়োগ করেছি।

স্ট্র্যাটফোর্ড—লণ্ডন যাতায়াতের রাস্তা মাত্র দুইটি, তখনও ছিল, এখনও আছে : অক্সফোর্ড ও হাই ওয়াইকুম্‌ হয়ে অথবা এইল্‌স্‌বেরি ও ব্যান্‌বেরি হয়ে। শেক্‌স্‌পিয়র প্রথম রাস্তাটি ব্যবহার করতেন। ১২০ মাইল রাস্তা, ঘোড়ায় চড়ে যেতে হত, তিনদিন লাগত, দ্বিতীয় রাত্রি যাপন করতেন অক্সফোর্ডে। অক্সফোর্ডের কর্ন মার্কেটে, হাই স্ট্রীট ও কর্ন মার্কেট স্ট্রীটের জংসন থেকে ৫০।৬০ গজ উত্তরে এগিয়ে গেলে, রাস্তার পূব পারে একটু ভিতরে একটি হোটেল আছে, The Golden Cross Hotel, একেবারে সেকেলে Ye Olde Inne ধরনের হোটেল। এই হোটেলে শেক্‌স্‌পিয়র বাস করতেন তাঁর যাতায়াতের পথে। ১৯৫৭ সালে এই হোটেলে দিন

কয়েক বাস করার সুযোগ আমার হয়েছিল, তখন লক্ষ্য করেছিলাম যে গৃহ-নির্মাণ প্রণালী বিচার করলে এই হোটেলের কাঠ, সিঁড়ি, জানালা, কক্ষগুলির মেজের উচ্চতা প্রভৃতি শটেরিতে অবস্থিত শেক্‌স্‌পিয়রের শ্বশুরবাড়ির মতোই অথবা হেনলি স্ট্রীটে অবস্থিত শেক্‌স্‌পিয়রের জন্মগৃহের মতোই। যাতায়াত কালে যে শেক্‌স্‌পিয়র একা চলতেন এমন মনে হয় না, সে কালে পথে ঘাটে রাহাজানি হ'ত সর্বদা আর প্রায়ই সরাই মালিকের সঙ্গে দস্যুদের যোগসাজস থাকত। এ হেন এক রাহাজানিতেই লিপ্ত হয়েছিল স্যর জন ফল্‌স্টাফ ও তার সঙ্গীরা। সে কালে গাড়ির প্রচলন মাত্র শুরু হয়েছিল, গাড়ির মিস্ত্রীর উল্লেখ করছেন মার্কুশিয়ো 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' নাটকে। জন্‌ স্টো-লিখিত লণ্ডনের যে-বিবরণ ১৫৯৮ সনে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তিনি আফশোষ করছেন যে শহরে নানারকমের গাড়ির সংখ্যা বড্ড বেড়েছে। ভ্রমণের অধিক-প্রচলিত উপায় ছিল অশ্বারোহণে অথবা পদব্রজে। এই কারণে ও যেহেতু যুদ্ধকালে অশ্বের প্রয়োজন ও মূল্য অতীব গুরুতর ছিল সেজন্য শেক্‌স্‌পিয়রে অশ্বের উল্লেখ অগণিত। আচম্বিতে মনে পড়ে যায় তৃতীয় রিচার্ডের আকুল কামনা :

A horse ! a horse ! my kingdom for a horse !

শেক্‌স্‌পিয়র লণ্ডনে গিয়েছিলেন জীবিকার সন্ধানে। সেই একই সন্ধানে সেকালে সঙ্গতিপন্ন বংশের ছেলেরা বিদেশে যেত, ইওরোপের দেশগুলিতে।

Other men, of slender reputation,
Put forth their sons to seek preferment out :
Some to the wars, to try their fortunes there ;
Some to discover islands far away ;
Some to the studious universities.

(The Two Gentlemen of Verona)

তৎকালীন সমাজের একাংশী নিখুঁত চিত্র এই ছত্র কয়টিতে অঙ্কিত হয়েছে। যে Law of Primogeniture ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত ছিল, যে আইন অনুসারে সমস্ত সম্পত্তি অটুট অবস্থায় জ্যেষ্ঠ পুত্রেই বর্তায়, সেই আইন অনুসারে অন্য ছেলেদের যার যার রাস্তা দেখতে হত, যেমন অবস্থা হয়েছিল "অ্যাজ ইউ লাইক ইট্‌" নাটকের অর্ল্যাণ্ডোর। পিতা জীবিত থাকতে কনিষ্ঠ ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতেন যার ফলে তারা পরবর্তীকালে বড়ো

আইনজীবী হতে পারত অথবা রাজনীতিবিদ অথবা উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক অথবা সৈন্যবিভাগে বা নৌবিভাগে জেনারেল বা অ্যাড্‌মিরাল। শেক্‌স্‌পিয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে এহেন জ্যেষ্ঠানুজ পুত্রের সংখ্যা কম নয়। কালে এরা কেউ কেউ নিজগুণেই হয়তো আর্ল বা ব্যারন হতেন। শেক্‌স্‌পিয়রের যুগে নতুন আরেকটি জীবিকা সাহসী যুবকদের সামনে খোলা ছিল—নবাবিষ্কৃত বিদেশে উপনিবেশ রচনা অথবা নবপ্রতিষ্ঠিত একচেটিয়া কারবারী সম্প্রদায়ে যোগদান করা। উপরের ছত্র কয়টিতে এই নব সামন্তবাদের আভাস পাই। শেক্‌স্‌পিয়র নিজে বিদেশে গিয়েছিলেন কিনা এমন প্রমাণ পাই না যদিচ অনেকের বিশ্বাস তিনি গিয়েছিলেন। বিদেশ-প্রত্যাগত ব্যক্তি সম্বন্ধে শেক্‌স্‌পিয়রের শ্লেষ আছে আবার ঘরকুনো লোক সম্বন্ধেও যেন তাঁর ধারণা উঁচু নয়।

> Hath Britain all the sun that shines ?...
>
> There's livers out of Britain.
>
> *(Cymbeline)*

অপর পক্ষে স্মরণ করি জ্যাকেসের প্রতি রজালিণ্ডের কৌতুকাবিষ্ট ব্যঙ্গ বাণী :—

> Farewell, Monsieur Traveller : look you lisp, and wear strange suits, disable all the benefits of your own country, be out of love with your nativity, and almost chide God for making you that countenance you are ; or I will scarce think you have swam in a gondola.
>
> *(As You Like It)*

বিদেশী পরিচ্ছদ ও রীতি সম্বন্ধে অনুকরণ শেক্‌স্‌পিয়রের কয়েক জায়গাতেই মৃদু শ্লেষের কারণ হয়েছে, যেমন "মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস্", "টেমিং অব্ দি শ্রু", "কিং জন্", "রোমিও অ্যাণ্ড্ জুলিয়েট" প্রভৃতি নাটকে।

বিদেশের মধ্যে ইটালীর মোহই ছিল প্রবলতম। শুধু যে রেনেসাঁসের যুগে মহৎ ইটালীয় শিল্প জগতে আপন শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেছে এমন নয়, ষোল শতক অবধি ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য প্রধানতঃ ইটালীয় বণিকদেরই হাতে ছিল। এই কালেই অবশ্য পোর্তুগাল, হল্যাণ্ড, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড এমন কি ডেনমার্কও এমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হলেন যার ফলে বাণিজ্যিক ভারকেন্দ্র ভূমধ্যসাগর থেকে সরে গেল ভারত সাগরে ও আমেরিকার পূর্ব উপকূলে। কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়রের কালেও টিন্‌টোরেট্টো জীবিত ছিলেন, তখন

ভেনিসের বিখ্যাত রিয়ালটো-সেতু নূতন স্থাপত্যে পুনর্নিমিত হচ্ছে, তখনও বেশভূষায় আদব কায়দায় ইটালীয় ফ্যাশান অন্য দেশীয়দের ঈর্ষা ও অনুকরণের বিষয়, ইটালী থেকেই ইংরেজ যুবকেরা শিখে এলো গলায় Ruff পরা, নিম্নাঙ্গে গায়ে-আঁটা গেঞ্জির পোষাক পরা, নানারকম শাদা ও লাল দ্রাক্ষারস পান করা, হাত দিয়ে না খেয়ে ছুরি ও কাঁটার ব্যবহার করা। হলোফার্নেস বলছে :

> I may speak of thee as the traveller doth of Venice :
>
> —Venetia, Venetia,
>
> Chi non te vede, non te pretia.
>
> *(Love's Labour's Lost)*

প্রায় দু'শো বছরের কূপমণ্ডুকতার পরে শেকসপিয়রের কালে সাহসী ইংরেজ যুবকগণ আবার অনুভব করলেন যে বিশাল বিশ্বের সব দিক থেকেই ডাক পৌঁছচ্ছে তাঁদের কাছে। ভৌগোলিক অর্থে ও মানসিক অর্থে শেকসপিয়রের যুগ যেন সহসা বিস্তীর্ণ হয়ে গেল, সেই বিস্তারের সুর শেকসপিয়রের নাটকে।

যখন শেক্‌স্‌পিয়র তার নাট্যকাহিনীগুলির উৎস খুঁজেছেন স্বদেশের বাইরে তখন যে প্রায়শঃ তিনি ইটালীয় কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন এ তথ্যের তাৎপর্য গভীর। ইটালীয় নামের মোহ সেকালে প্রবল, ইটালী সে যুগে ইওরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরম আদর্শ। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে কাহিনী ও কুশীলব ইটালী থেকে নেওয়া হলেও কাহিনীর আবেদন ও চরিত্রের অন্তর্নিহিত মূল্য সম্পূর্ণ রকমে ইংরেজ। উনিশ শতকী অর্থে শেক্‌স্‌পিয়র রিয়লিস্ট নন। ইতিহাসের যথাযথতা আয়ত্ত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। সার হেন্‌রি আর্ভিং নাটক মঞ্চস্থ করার পূর্বে মোটা মোটা বই পড়ে ফেলতেন যাতে কিনা দৃশ্যপটে ও পোষাকে ঐতিহাসিক যথাযথতার ত্রুটি না থাকে। চার্লস্ কিংসলি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার জন্য দিনের পরে দিন ব্রিটিশ মিউজিয়মে কাটিয়েছেন। ঐতিহাসিক তথ্যের এ হেন খণ্ডিত সত্য প্রকাশের চেষ্টা করেন নি শেক্‌স্‌পিয়র। তাঁর লক্ষ্য ছিল আরও মহৎ সত্য, আরও স্থায়ী সত্য, যাকে বলি মানবিক সত্য। সাহিত্যে সেই সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় গ্রন্থকীটের পাদটীকা-মুখর ক্লিষ্ট বিদ্যায় নয়, প্রতিষ্ঠা হয় সহানুভূতি-সম্পন্ন সর্বধাত্রী কল্পনার দুর্বার দাক্ষিণ্যে, প্রতিষ্ঠা হয় শেক্‌স্‌পিয়রের কল্পনায়। শেক্‌স্‌পিয়র মৃত ইতিহাসকে সত্য বলে মানেন নি, মেনেছেন জীবিত সমকালকে। ফলে এথেন্স-নগরীর থিসিয়ুস্-চরিত্র এথিনিয়ন ইতিহাসের তথ্য-সঙ্গত হয় না, হয়ে

দাঁড়ায় ষোল শতকী ইংরেজ চরিত্র। যে সব কোলাহলকারী জনতা 'জুলিয়স সীজার' ও 'কোরিওলেনাস্' নাটকে জনচাঞ্চল্যের প্রতীক তারা আসলে জ্যাক্ কেইডের ইংরেজ 'মব্' থেকে কিছুমাত্র পৃথক নয়। রোজালিণ্ড, অর্ল্যাণ্ডো, সীলিয়া প্রভৃতি বিদেশী নামের সঙ্গে ঘরোয়া নাম অড্রি ও কেইট শোভা পায়। হার্মিয়া লিসাণ্ডার হেলেনা ডিমিট্রিয়াস আপাতদৃষ্টিতে ইংরেজ নয় কিন্তু Quince, Snug, Bottom, Flute, Snout, Starveling এরা তো লণ্ডনের থিয়েটর-দর্শকদের সুপরিচিত ইংরেজ মনুষ্য!—দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায় কিন্তু দেওয়ার দরকার নেই কেননা পাঠক অতি সহজেই স্মরণ করবেন যে শেক্স্পিয়রে historical veracity-র প্রয়াস নেই, তিনি থীসিস্ লিখতে বসেন নি, শেক্স্পিয়রে আছে আরও মহৎ বস্তু, imaginative verisimilitude, তথ্যের হুবহুতা নয়, কল্পনার সত্য। মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের চাঁইবুড়োর কথা :—

> —'তুমি যে আজকালকার ছেলে—হিষ্টিরি পড়ে কেউ কল্পনা করতে পারে ?'
>
> —'তবে ?'
>
> —'তবে আবার ? ছাখো অবুবাবু, এই আমি সেকালের বুড়ো—হিষ্টিরি-পড়া মানুষ নয়, তাই কল্পনা করতে আমার ঠেকে না একেবরেই।'

শেক্স্পিয়রও হিষ্টিরি-পড়া মানুষ ছিলেন না, তাঁরও কল্পনা করতে ঠেকত না একেবারেই। অতএব নাট্যকাহিনীর দেশ ও কাল যেখানেই এবং যেকালেই থাক না কেন, থেকেছে অনেক দেশে অনেক কালে—তমসাচ্ছন্ন অনৈতিহাসিক প্রাক-খৃষ্টীয় যুগে, বোহিমিয়ায়, রোমে ও কায়রোতে, ভেনিসে, নাম-না-জানা দ্বীপে, বনে বা গ্রামে অথবা লণ্ডনে অথবা কোনও বিদেশী শহরের রাজপথে—শেক্স্পিয়র সব কিছুকেই ইংরেজায়িত করেছেন। সব কিছু ঘটনার তাৎপর্য সংশ্লিষ্ট হচ্ছে সমকালীন ইংল্যাণ্ডের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে, সব কয়টি চরিত্র, নামের ও পোষাকের বিদেশীয়ানা সত্ত্বেও, আসলে ইংরেজ। Scratch a Russian and you'll find him a Tartar—বলা হত একশো বছর আগে। Scratch a Shakespearean character and you'll find him an Englishman of the Elizabethan Age।

জানিনা এই প্রবন্ধের পাঠক আমার এই উক্তিটি শেক্স্পিয়রের পক্ষে

প্রশংসা বা নিন্দা বলে জ্ঞান করবেন কি না, আমার ধারণায় আমার উপরোক্ত উক্তি বাণীশিল্পের পরম প্রশংসা। আমি বলছি শেকসপিয়রের শিল্পে চিরন্তন মানবিক সত্য বিদ্যমান, যে-সত্য (অবনীন্দ্রনাথের উক্তি অনুসারে) কল্পনার সত্য, ইতিহাসের নয়।

এই মানবিক সত্য যে শেকসপিয়রে সাধিত হয়েছে তার চরম কারণ তো অবশ্য তাঁর সৃজনী কল্পনার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া, যে-শক্তি আজ অবধি বিশ্লেষণসাধ্য হয়নি। এই চরম কারণের পরেই স্থান দেব শেকসপিয়রের অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের। এই মাটির পৃথিবীতে শেকসপিয়র নিয়ত সুবদ্ধচরণ, তিনি যতই উর্ধ্বে তাকান, তাঁর দৃষ্টি হয়তো দূর থেকে দূরতর রহস্যের সন্ধান করছে কিন্তু তাঁর দৃষ্টির পরিধি থেকে সামান্য পৃথিবী কখনও বিলুপ্ত হয় না। তিনি কখনও ইন্দ্রিয়জ্ঞানগম্য প্রত্যক্ষ বস্তুময় সত্যকে দুর্বল করেন নি, সেজন্যই তাঁর কল্পনা সত্য ও চির মহৎ।

পাঁচ

স্ট্রাটফোর্ড ছেড়ে, কট্সোল্ডের নিচু পাহাড় পেরিয়ে, অক্স্ফোর্ডের মধ্য দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে, হাই ওয়াইকুমে অল্পক্ষণ থেমে শেকসপিয়র প্রবেশ করলেন ষোলশতকী লণ্ডনে। প্রথমে কোথায় উঠেছিলেন সঠিক জানা যায় না তবে গোড়ার দিকেই টাওয়ারের উত্তর-পশ্চিমে বিশপ্স্ গেটে বাস করতেন। শহরে ঢুকে হয় কভেণ্ট গার্ডেন—ফ্লিট স্ট্রিট—সেণ্টপল্স্—চিপ্সাইড্ হয়ে অথবা সেণ্ট জাইল্স্—হবর্ণ—নিউগেট—চিপ্সাইড্ হয়ে ঢুকলেন নিজ মহল্লায়। সেকালের ও একালের স্ট্রাট্ফোর্ডে যদি প্রচণ্ড পার্থক্য দেখা না দিয়ে থাকে, সেকালের লণ্ডনে ও একালের লণ্ডনে প্রায় আকাশপাতাল প্রভেদ। শহরে তখন এক লক্ষের বেশি অধিবাসী ছিল না। আজকের জনবহুল শহরতলিগুলি সেকালে ছিল গ্রাম। উলিচ্—গ্রীনিচ্—ডালিচ্—ক্রয়ডন্—ক্লাপাম্—চেল্সি—পাট্নি প্রভৃতি পূব-দক্ষিণ-পশ্চিমের পাড়াগুলি, হ্যাম্স্টেড্—হাইগেট—ইল্ফোর্ড প্রভৃতি উত্তর লণ্ডনের প্রান্তগুলি তখনও সর্বগ্রাসী রাজধানীর কুক্ষিগত হয় নি। বস্তুতঃ লণ্ডন্ শহরের এলাকা ছিল পশ্চিমে ওয়েস্টমিন্স্টার অ্যাবে থেকে রেখা টেনে হোয়াইটহল পেরিয়ে, টেম্পল্ পেরিয়ে, সেণ্টপলের ক্যাথিড্রাল অতিক্রম করে টেম্স্ নদীর পাড়ে পাড়ে, স্ট্রাণ্ড রাজপথ বেয়ে, পূর্বসীমায় টাওয়ার অব্ লণ্ডন্ হোয়াইট চ্যাপেল অবধি।

শহরটি চওড়ায় কোথায়ও নদীতীর থেকে দু মাইলের বেশি ছিল না। নদীর এপারে ওপারে যাতায়াতের জন্য একটি মাত্রই সেতু ছিল, সুপ্রাচীন লণ্ডন্ ব্রিজ, তার দক্ষিণে নদীর ওপারে ছিল সাউথওয়র্ক পল্লী যেখানকার টাবার্ড নামক সরাইখানায় দুশো বছর আগে জেফ্রি চসর্ রাত কাটিয়েছিলেন, আর এই পল্লীতেই অবস্থিত ছিল শেকসপিয়রের গ্লোব থিয়েটর। খড়-ছাওয়া এই থিয়েটর-গৃহ পুড়ে' ছাই হয়ে যায় ১৬১৩ সালে যখন শেকসপিয়র-রচিত 'অষ্টম হেনরি' অভিনীত হচ্ছিল। দ্বিতীয়বার নির্মিত হয়েছিল থিয়েটর-গৃহ কিন্তু ১৬৪৪ সনে সেই বাড়ি ভেঙে ফেলে ভাড়াবাড়ির ফ্ল্যাট তৈরি হয়। আজ আর শেকসপিয়রের গ্লোব থিয়েটরের কোনই চিহ্ন নেই।

শেকসপিয়রের পাড়া বিশপস্‌গেট থেকে অনতিদূরে প্রাচীন লণ্ডন প্রাচীরের বাহিরে ছিল কতকগুলি মাঠ, মূর ফিলড, স্পিটাল ফিলড, মাইল এণ্ড। এসব মাঠে কুচ কাওয়াজ হত। বিশেষতঃ শেকসপিয়র আনুমানিক যে সময় লণ্ডনে প্রথম যান, সে-কালেই স্প্যানিশ আক্রমণের আশঙ্কায় প্রচণ্ড সমরোদ্যম চলছিল শহরে ও আশেপাশে। যে উদ্দীপনায় তখন দেশে রংরুট যোগাড় হচ্ছিল তার কিছু চিত্র পাওয়া যায় 'চতুর্থ হেনরি' নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে এবং অতি-সাধারণ লোকের চিত্তাবস্থার সুন্দর প্রকাশ পাওয়া যায় ফীব্‌ল্ নামক রংরুটের শাদামাটা কিন্তু বাস্তবিক নির্ভীক উক্তিতে ;

By my troth, I care not ; a man can die but once ; we owe God a death. I'll ne'er bear a base mind. An't be my desting, so ; an't be not, so. No man's too good to serve's Prince ; and let it go which way it will, he that dies this year is quit for the next.

এ এক আশ্চর্য heroic unheroism, বীরপুরুষ হওয়ার কোনও চেষ্টা নেই চেতনা নেই বলেই ফীব্‌ল্-এর কথাগুলিতে একটা অসামান্য সরল শৌর্য প্রস্ফুট হয়েছে। আমাদের দেশে এককালে অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত নায়ক নিয়ে এত উচ্ছ্বাস হয়েছে যে আজ আমি পেন্‌ডুলাম-গতির বিপরীত প্রান্তে পৌছে, জনগণের মানস নিয়ে নতুন কোনও Mystique বা রহস্যবাদ প্রস্তুত করব না কিন্তু এই ফীব্‌ল্-চরিত্রের সূত্র ধরে এই কথাটি বলব যে শেকসপিয়রের সাধারণ মানুষের চরিত্রে ও কর্মে যে অচেতন নিষ্প্রয়াস শৌর্য ও মহত্ব প্রকাশিত সে বিষয়ে পাঠকেরা বা দর্শকেরা সচরাচর ওয়াকিবহাল নন।

জনগণ সম্বন্ধে শেকসপিয়রের মনোভাব কি প্রকার ছিল এই নিয়ে কিছু পল্লবগ্রাহী আলোচনা হয়েছে বটে, কেউ বলেছেন শেকসপিয়র জনবিরোধী সামন্তপূজক, কেউ হয়তো অতি ক্লিষ্ট ব্যাখ্যায় দেখেছেন শেকসপিয়র প্রগতিশীল গণবাদী। সাময়িকী প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে এই গুরুতর বিষয়ে আমি আলোচনা করতে পারছি না, কেবল আমার প্রত্যয় প্রকাশ করব যে প্রথমত শেকসপিয়রের চিন্তা মতবিলাসী নয়, প্রত্যক্ষপন্থী, অর্থাৎ তিনি জীবনে রং চড়াননি, যেমনটি দেখেছেন জীবন তেমনটি এঁকেছেন, যার ফলে কোনো অনাবিল শুভ্রতা বা দীপ্তিহীন তমিস্রা তাঁর চিত্রপটের একচ্ছত্র অধিপতি নয়, অগ্রগতি অথবা পশ্চাৎগতি 'ছোটলোক' বা 'বড়োলোক' কারুরই একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। দ্বিতীয় কথা যে শেকসপিয়র-সাহিত্যে সমাজের উচ্চকোটি নরনারী (ধরুন বেরৌন অথবা বিয়াট্রিস অথবা পোর্শিয়া অথবা হ্যামলেট) যে-পরিমাণে ইংরেজ (অর্থাৎ কুশীলব হিসাবে যদিও তারা অন্য দেশবাসী হতে পারে, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারেই ইংরেজ-সুলভ), নিম্নকোটির নরনারী সে পরিমাণে আরো খাঁটি ইংরেজ। নাটকের ঐতিহাসিক প্রয়োজন বিচারে এই সব সাধারণ নরনারী হয়তো কেউ মিশরের, কেউ রোমের, কেউ বোহিমিয়ার, কেউ ভেনিসের, কেউ এথেন্সের অধিবাসী, কিন্তু তাদের মনোভঙ্গী সম্পূর্ণতঃ ইংরেজ। এক্ষেত্রেও শেকসপিয়রের রচনায় প্রত্যক্ষজ্ঞান কার্যকরী। লণ্ডনের বিচিত্র জনপ্রবাহ নিশ্চয় তাঁর মনে সাড়া জাগিয়েছিল, জনতার সম্মিলিত রূপ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন আবার জনতার স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তাগুলিকেও অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, আর তারই ফলে এই সাধারণ লোকগুলি তাঁর রচনায় আশ্চর্য জীবন-সাদৃশ্য লাভ করেছে। আমার বিশ্বাস কেউ যদি শেকসপিয়র-সাহিত্যের lesser charactersগুলি অধ্যয়ন করেন, যে সব নাম-না-জানা চরিত্র অথবা যে সব চরিত্র মাত্র দুই একবার আবির্ভূত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, যারা নাটকের প্লট-বিন্যাসে আদৌ সুসংশ্লিষ্ট নয়, তাহলে মানবচরিত্র সম্বন্ধে শেকসপিয়রের মূল প্রত্যয় প্রণিধান করতে পারবেন।

সচরাচর শেকসপিয়রের নাটকে প্রধান চরিত্রগুলি সমাজের উচ্চ কোটি-সম্ভূত হয়ে থাকে, তারা রাজবংশীয় অথবা প্রতিষ্ঠাবান জননেতা বা সৈনিক। সাধারণ মামুলী লোক, খেটে-খাওয়া মানুষ, অথবা পেশাদার মধ্যবিত্ত লোক (যেমন শিক্ষক, চিকিৎসক, ধর্মযাজক ইত্যাদি) শেকসপিয়রের নাটকে সর্বত্রই উপস্থিত বটে কিন্তু গোড়ার দিকের কয়েকটি নাটকে (যথা 'টু জেন্ট্‌ল্‌মেন্

অব্ ভেরোনা' 'মেরি ওয়াইভ্স্ অব্ উইণ্ডসর্', 'কমেডি অব্ এরর্স', 'টেমিং অব্ দি শ্রু') যেটুকু প্রাধান্য পেয়েছে এই শ্রেণীর লোকেরা, পরিণত নাটকে তেমনটি হয় নি। শেকসপিয়রের সমসাময়িক ডেকার যেমন মেহনতী লোকের কাহিনী রচনা করেছেন, বেন জন্সন্ অথবা ম্যাসিঙ্গার যেমন মধ্যবিত্ত মানুষকে কেন্দ্রস্থলে রেখেছেন, শেকসপিয়র তেমনটি করেন নি বলে যদি পিচ্ছিল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই যে শেকসপিয়র নিম্নকোটি লোক সম্বন্ধে দরদী ছিলেন না, অথবা তাঁর সমাজবোধ ছিল একপেশে, তাহলে আমাদের সাহিত্যপাঠে কিছু খেলোমি আছে বুঝতে হবে। শিল্পের প্রকৃতি এমন হালকা নয় যে কাহিনীর নায়ক রাজপুত্র না ঝাড়ুদার সেই বিচারে কাহিনীকারের সমাজবোধ সাব্যস্ত করব। আমাদের আসল মানদণ্ড শিল্পীর মনোভঙ্গী। শেকসপিয়রের অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে প্রত্যেক চরিত্রের মূল মানবতা উদ্‌ঘাটিত ও উজ্জ্বল হয়েছে। চরিত্রের বৃত্তি যেন পোষাকের মতো, তার সাহায্যে চরিত্রটির প্রত্যক্ষ বস্তুময়তা (concrete reality) প্রমাণ হয়েছে, চরিত্রটি ইতিহাসের এলাকায় এসেছে, কিন্তু কোনো মানুষই কেবল বৃত্তি নয়, জাতি নয়, দেশবাসী নয়, প্রত্যয়াবলম্বী নয়, মানুষ আবার শাশ্বত মানুষও বটে। শেকসপিয়রের নায়ক মেহনতী লোক নয়। বস্তুতঃ ইংরেজি সাহিত্যে সর্বপ্রথম আঠারো শতকের ঔপন্যাসিকদের হাতে, বিশেষত উনিশ শতকে ডিকেন্সের হাতে, মেহনতী লোক প্রতিষ্ঠালাভ করে সাহিত্য জগতে।' শেকসপিয়রের কালে জনরুচি ছিল দীপ্তিময় গ্লামরাস্ উচ্চবিত্ত নায়কের সপক্ষে, শেকসপিয়র সমকালীন সাহিত্যরুচি মেনেছেন, আর এই রুচি যে শিল্পকৃতির মানদণ্ডে অগ্রাহ্য এমন বলতে পারি না। শেকসপিয়রের লিয়র ও টুর্গেনিভের লিয়র অব দি স্টেপ্স্, শেকসপিয়রের হ্যামলেট ও টুর্গেনিভের রুডিন যে বিভিন্ন আবেগ পাঠক চিত্তে সংক্রামণ করে তার কারণ যে চরিত্রগুলির সামাজিক আসন একেবারেই নয় এমন বলতে পারি না। কিন্তু যদিও মেহনতী লোকেরা, নিম্নবিত্ত লোকেরা, নায়কের মর্যাদা পায় নি, তবুও কী আশ্চর্য সমানুভূতি, সমদর্শিতা, সংবেদনা দিয়ে শেকসপিয়র তাদের সৃষ্টি করেছেন! সমকালের প্রায় যাবতীয় শ্রেণীর পেশা ও ব্যবসায় বিধৃত হয়েছে তাঁর নাটকে। কয়েকটি পেশার উল্লেখ করছি: Schoolmaster, friar, parson, doctor, nurse, physician, nun, vicar, sexton, lawyer, alderman, sheriff, country Justice ; sailor, soldier ; gardener, constable, page, inn-keeper, pedlar ; courtezan, bawd,

Executioner ; vintner, drawer, carrier, goldsmith, carpenter, joiner, bellows-mender, tinker, tailor, haberdasher, masker, torch-bearer, guard, watchman, jeweller, mercer। ষোল শতকী ইংল্যাণ্ডে কত রকম পেশা অনুসৃত হত তার কিছু ধারণা হয় আমার এই অসম্পূর্ণ তালিকা থেকে। নাটকের প্রয়োজনে হয়তো বলা হয়েছে যে এরা রোমের লোক, ভিয়েনার লোক, কিন্তু নামে কাজে চরিত্রে এরা খাঁটি ইংরেজ। হয়তো স্ট্র্যাটফোর্ডে অথবা লণ্ডনে অথবা অন্যত্র শেকসপিয়র দেখে থাকবেন এদের স্থূলমূর্তি, তারপরে সুযোগমতো এদের রূপায়িত করেছেন নিজ নাটকে।

সমকালীন জীবনের অধিক অংশই শেকসপিয়র-নাটকে বিধৃত হয়েছে। রাজা রাজড়ার জীবন তো হয়েইছে, সে বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ এ-প্রবন্ধে অনাবশ্যক। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে শেকসপিয়র সেকালের ক্রমবর্ধমান ভিক্ষুকদের সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ করেন নি, কেবল জ্যাক কেইডের মুখে দুই একটি কথা ছাড়া এবং বণিকদের প্রতি তেমন মনোযোগী হননি। 'মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস' নাটকে অবশ্য বণিক বর্তমান আরও দুই একটি নাটকে বণিকের আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু যে হিসাবে বেন্ জনসনের নাটকে দেখানো হয়েছে যে (অধ্যাপক এল্ সি নাইট্স্ যেমন বিশ্লেষণ করেছেন) সেকালের ইংরেজ সমাজের বিবর্তনের ফলে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে টাকা-খাটানো লোকের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল, পুঁজিপতিদের সৃষ্টি হল আর তার ফলে নৈতিক আদর্শ ও আচরণ বদলালো, সে হিসাবে শেকসপিয়রের নাটকে সমাজের কোনও নব সূচনা সম্বন্ধে চেতনা দেখতে পাই না। পিউরিটানদের তিনি অপছন্দ করতেন। মালভলিও তাঁর নাটকে অপদস্থ হয়েছে এবং সার টোবি বেল্‌চের উক্তি এ-প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয় বটে কিন্তু শেকসপিয়রে এমন কোনোও আভাস নেই যে এই পিউরিটান মনোবৃত্তি অচিরে পরাশ্রয়ী ঐশ্বর্যলালিত সামন্তের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে। প্রত্যক্ষের যে জ্ঞান শেকসপিয়রকে অনবরত নিয়ে গেছে সমসাময়িক মানুষের দিকে সে জ্ঞান তাঁকে আগামী কালের সম্ভবপর সমাজের দিকে নেয় নি। সেই হিসাবে শেকসপিয়র পুরোপুরি স্বকালবদ্ধ। শেকসপিয়র খাঁটি Londoner। চসরের মতো, ডিকেন্সের মতো, শেকসপিয়র সমকালের লণ্ডনে পেয়েছেন মানব-চরিত্রের ও মানুষের গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত অসংখ্য আচরণের রূপ, তাইতেই

সন্তুষ্ট থেকেছেন, প্রত্যক্ষের নিশ্চিত ক্ষেত্র ছাড়িয়ে অনাগত কালের সম্ভাব্যরূপ কল্পনা করেন নি।

ছয়

প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে যে মানব সমাজ গড়ে উঠল শেকসপিয়র-সাহিত্যে সেই সমাজের মানস মূর্তিটি কেমন ? কোন্ কোন্ প্রধান ধ্যান ধারণা শেকসপিয়র পেয়েছিলেন সমকাল থেকে !

এককালে বলা হত যে শেকসপিয়র অল্পশিক্ষিত ছিলেন, তাঁর লিখনপটুতা এক আশ্চর্য অশিক্ষিত-পটুত্ব মাত্র। শেকসপিয়রের জীবনী ও তাঁর কাল সম্বন্ধে আমাদের তথ্যজ্ঞান ও বোধ বাড়ার ফলে আজকাল আমরা জেনেছি যে শেকসপিয়র অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান পান নি কিন্তু তেমন জ্ঞানের মাত্র দুই এক ধাপ নিচেকার জ্ঞান ও শিক্ষা তিনি অর্জন করেছিলেন। স্ট্র্যাটফোর্ডের গ্রামার স্কুলে তিনি পড়েছিলেন এবং তাঁর হেডমাস্টার টমাস জেন্‌কিন্‌স্ লেখাপড়া বিষয়ে খুব সহজে সন্তুষ্ট হওয়ার লোক ছিলেন না। বস্তুতঃ আমেরিকান অধ্যাপক টমাস বল্‌ডুইন তাঁর মন্থর বিশাল গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে বেন্ জন্‌সন্ যা-ই বলুন না কেন, সেকালকার গ্রামার স্কুলের প্রথা অনুসারে শেকসপিয়র যে বিদ্যালাভ করেছিলেন তা' কী গুণে কী পরিমাণে আদৌ অবজ্ঞেয় নয়। শেকসপিয়র একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, অপর দিকে তেমনি গ্রন্থপাঠ দ্বারাও জ্ঞান বাড়িয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থগত জ্ঞান সম্বন্ধে আমি ডকটর জন্‌সনের কয়েকটি বাক্য উধৃত করব যা জন্‌সন্ প্রয়োগ করেছিলেন ড্রাইডেন সম্বন্ধে।

I rather believe that the knowledge of Dryden was gleaned from accidental intelligence and various conversation, by a quick apprehension, a judicious selection, and a happy memory, a keen appetite of knowledge, and a powerful digestion; by vigilance that permitted nothing to pass without notice, and a habit of reflection that suffered nothing useful to be lost.…I do not suppose that he despised books or intentionally neglected them; but that he was carried out, by the impetuosity of his genius, to more vivid and

speedy instructors, and that hls studies were rather desultory and fortuitous than constant and systematical.

অর্থাৎ মনীষার যে বিশেষ ধর্ম জন্‌সন্ লক্ষ্য করেছিলেন ড্রাইডেনে সেই ধর্মের পরাকাষ্ঠা বলে' যদি আমরা শেকসপিয়রকে বিচার করি তাহলে মানতে হবে যে শেকসপিয়র জ্ঞান আহরণ করেছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, অন্যের সঙ্গে আলোচনা দ্বারা, এবং প্রয়োজন মতো গ্রন্থ পাঠ থেকে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল আমাদের শিখিয়েছেন যে জ্ঞানার্জনের সুষ্ঠু প্রণালী এই তিনটিই। শেকসপিয়র বই পড়তেন—যথা, প্লুটার্ক (অনুবাদে), অভিডের 'মেটামরফসিস' মূল লাটিনে, হলিন্‌শেড, আর্কেডিয়া, ইউফুয়েস, সর্বোপরি বাইবেল, এ হেন কয়েকটি গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে এগুলি তিনি পড়েছিলেন। অন্য বই আছে যেগুলি পড়লেও পড়ে থাকতে পারেন, আবার হয়তো সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা শুনে থাকতে পারেন—যথা, মেকিয়াভেলির 'ইল্ প্রিন্স্' নামক গ্রন্থ। আর ধরুন স্যর ওয়ল্টার রলে'র School of Night নামক দুঃসাহসী সংশয়বাদী প্রায়-নাস্তিক গোষ্ঠীর আলোচনায় অথবা মার্মেড ট্যাভার্নের উচ্চকণ্ঠ তার্কিকদের আড্ডায় কী ধরনের মনের খোরাক শেকসপিয়র পেতেন সে বিষয়ে কিছু ধারণা করতে পারি ফ্রান্সিস্ বোমন্ট যে পদ্য-পত্র লিখেছিলেন বেন্ জন্‌সনের কাছে সেটি থেকে :

What things have we seen
Done at the Mermaid! heard words that have been
So nimble and so full of subtle flame,
As if that every one from whence they came
Had meant to put his whole wit in a jest,
And had resolved to live a fool the rest
Of his dull life.

মননশীলতার এই শাণিত তীব্র আবহাওয়ায় স্বভাবতই শেকসপিয়র সমকালীন চিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

সেকালে লণ্ডনে রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল। পনেরো শতকের অনেক অনিশ্চয়তা ও ক্লেশের পরে যখন টিউডর রাজবংশ সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হল আর নানা বিপর্যয়ের পরে এলিজাবেথের আমলে

শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রবর্তিত হল তখন একদিকে যেমন সরকারী ভাবে (যথা আর্চ বিশপ হুকারের Laws of Ecclesiastical Polity নামক গদ্যগ্রন্থে) এই শান্তির সমর্থন হল, অন্যদিকে অনেক সাহিত্যিক (শেকসপিয়র স্বয়ং) এই শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রচার করলেন। শেকসপিয়র থেকে একটিমাত্র উধৃতি দেব, যদিচ দীর্ঘ উধৃতি :

Degree being vizarded,
Th' unworthiest shows as fairly in the mask.
The heavens themselves, the planets, and this centre,
Observe degree, priority, and place,
Insisture, course, proportion, season, form,
Office, and custom, in all line of order :
And therefore in the glorious planet Sol
In noble eminence enthron'd and spher'd
Amidst the other, whose med'cinable eye
Corrects the ill aspects of planets evil.…
… … But when the planets
In evil mixture to disorder wander,
What plagmes and what portents, what mutiny,
What raging of the sea, shaking of earth,
Commotion in the winds ! Frights, changes, horror,
Divert and crack, rend and deracinate,
The unity and married calm of states
Quite from their fixture ! O, when degrre is shak'd,
Which is the ladder of all high designs,
The enterprise is sick ! How could communities,
Degrees in schools, and brotherhood in cities,
Peaceful commerce from dividable shores,
The primogeneity and due of birth,
Prerogative of age, crowns, sceptres, laurels,
But by degree stand in authentic place ?

Take but degree away, untune that string,
And hark what discord follows !

(*Troilus and Cressida*)

এই ডিগ্রী দ্বারা, উচ্চনীচের ব্যবধান দ্বারা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালিত হচ্ছে, হচ্ছে মানবসমাজও। সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চনীচ ব্যবধান। স্কুলের ছাত্ররা কেউ উঁচু শ্রেণীতে কেউ নিচু শ্রেণীতে পড়ে। নগরে নগরে নানাপ্রকার সমিতি সম্প্রদায় থাকে, সেখানেও সদস্যদের মধ্যে কেউ উচ্চ পদাধিকারী কেউ বা নিচুতে। যে সব বণিকেরা দেশ ছেড়ে দুস্তর বিদেশে ভ্রমণ করেন তাদের মধ্যেও গুণকর্মের বিভাগ, অর্থাৎ ডিগ্রীর ব্যবধান, বর্তমান। সংসারে যে ভাই আগে জন্মায় সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মান ও দায়িত্ব অন্য ভাইদের চেয়ে বেশি। যিনি বৃদ্ধ তাঁরও সম্মান বেশি। এই ডিগ্রীর মাহাত্মেই মুকুট ও রাজদণ্ডধারী ব্যক্তির সামাজিক সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অন্য যাবতীয় ব্যক্তির চেয়ে অধিক। অতএব জীবনের মূল নীতি হচ্ছে ডিগ্রী।—এ-বিশ্বাস ইউলিসিসের একার নয়, স্বয়ং শেকসপিয়রের বলে, মানা গেছে, মানা গেছে অনেক সঙ্গত কারণে যেগুলির প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলা যায় যে এই ডিগ্রী-প্রত্যয় শেকসপিয়রে অন্য অনুরূপ প্রসঙ্গে পাওয়া যায়, এই প্রত্যয় সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তার গোড়ার কথা, এবং সমকালীন ইংরেজি সাহিত্যের সর্বত্র পাওয়া যায়। উপরন্তু, শেকসপিয়র সম্বন্ধে যতদূর আমরা জানি, তাতে জানি যে মানুষ হিসাবে তিনি ডিগ্রীতে বিশ্বাস করতেন যদিচ মানুষকে তুচ্ছ করতেন না আর জানতেন যে ডিগ্রী নামক সমাজধর্মের চেয়েও মানবধর্ম মহত্তর।

ডিগ্রী শুধু সমাজধর্মই নয়। খ্রীষ্টীয় প্রত্যয়, প্লেটোর ধারা-অনুযায়ী প্রত্যয়, দুইয়েই ডিগ্রী সমর্থিত। স্বর্গে যেখানে মহান ঈশ্বর রাজসভা সাজিয়ে বসে আছেন, তাঁর চারিদিককার সভাসদগণ (অর্থাৎ আর্কেঞ্জেল, এঞ্জেল, সেরাফ, চেরাব প্রভৃতি দেবাংশী সত্তাগণ) এই ডিগ্রীর তারতম্য মেনেই কেউ বসেছেন প্রথম সারিতে, কেউ বসেছেন পিছনের সারিতে। (এই মধ্যযুগীয় প্রত্যয়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপ দান্তের ডিভিনা কম্‌মেডিয়াতে এবং যদিচ শেকসপিয়র যে চার্চ অব ইংল্যাণ্ড মানতেন সেই চার্চ দান্তের মানা ক্যাথলিক মত অনেকটা পালটে দিয়েছিল, তাহলেও অন্যান্য অনেক চিন্তার মতোই ঐশ্বরিক রাজসভার কল্পনাটি ত্যাগ করে নি।

এই ডিগ্রী যখন এমনই মূল্যবান প্রভাবশালী সর্ববিষয়চালক শক্তি, ডিগ্রীর ব্যত্যয় হলে কী হতে পারে? শেকসপিয়র বলছেন যে ব্রহ্মাণ্ডে যে Order, যে-শৃঙ্খলা, বিদ্যমান তা ধ্বংস হবে আর পরিবর্তে আসবে প্রলয়, জাগতিক বিপর্যয় ও ধ্বংস। শেকসপিয়র বর্ণনা করছেন, ঝড় আসবে, মেদিনী কম্পিত হবে, সমুদ্র উথলে উঠবে, আধি ব্যাধিতে পৃথিবী ভরে যাবে। (শেকসপিয়র সম্ভবত সেণ্ট জনের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ভাবছেন যেখানে সেই সাংঘাতিক আখেরি দিবসে, 'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর!', pestilence ছড়াবে সর্বত্র!)

কিন্তু ডিগ্রীর ব্যত্যয়ে শুধু পৃথিবীই ধ্বংস হবে না, হবে সৌরজগৎও। প্লেটো বলেছিলেন, গ্রীক প্রাচীনেরা মানতেন, যে সৌরমণ্ডলের যাবতীয় গ্রহনক্ষত্র যার যার কক্ষে আবর্তিত হওয়ার সময় যে-ধ্বনি সৃষ্টি করে সে-ধ্বনির সমবেত তানে একটি মহাব্যোমময় মহান সাঙ্গীতিকী একতান উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডীয় সুরে সমস্ত বিশ্বের গতিবিধি বাঁধা। এই গতিবিধিতেও ডিগ্রী, শৃঙ্খলা। যদি ডিগ্রী যায়, তাহলে ব্রহ্মাণ্ডীয় সুরও বিশৃঙ্খল হবে অর্থাৎ ধ্বংস হবে।

অতএব শেকসপিয়রের ও ষোল শতকের ডিগ্রী-প্রত্যয়, শৃঙ্খলা-দর্শন সে-যুগের জীবন-দর্শনের গোড়ার কথা। এই দার্শনিক প্রত্যয়ে বিধৃত তাদের সমাজবিধি, আইন, রাজনীতি, অর্থনীতি, ঈশ্বরোপাসনা, বিশ্বপ্রত্যয়। আজ যেমন আমাদের প্রত্যয়গুলি খণ্ডিত, পরস্পরে অসঙ্গত, অর্থাৎ আমার ঈশ্বরপ্রত্যয়ে ও আমার রাজনীতিতে অথবা অর্থনীতিতে হয়তো বিরোধ থাকতেও পারে, শেকসপিয়রের কালে এমনটি ছিল না। সেকালে সচরাচর সমস্ত প্রত্যয় একসূত্রে গাঁথা থাকত।

এই ডিগ্রীপ্রত্যয় থেকে থেকে আরেকটি প্রত্যয়ে পৌছেছিলেন সে যুগের মনীষী—নেতৃত্ব-প্রত্যয়ে। এই প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদটি সমাপ্ত হয়েছে 'পঞ্চম হেন্‌রি' থেকে উধৃত একটি দীর্ঘ স্তবকে। এই স্তবকে মধুমক্ষী-সমাজের বিশদ বর্ণনার সাহায্যে বলা হচ্ছে যে গুণকর্মের বিভাগ অনুসারে বৃত্তি নির্ধারিত হয়, অনেক কর্মী থাকে সমাজে কিন্তু সে-সব কর্মীকে চালনা করার লোক দরকার, সেই সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তি হচ্ছেন এম্‌পারার, সম্রাট, মহারাজ। অধ্যাপনা-কক্ষে ইদানীং যে-প্রত্যয়কে আমরা Divine Right Theory of Monarchy বলে থাকি, সেই দৈব অধিকারের

ধারণা এই ডিগ্রী-প্রত্যয়ের ও নেতৃত্ব-প্রত্যয়ের অবধারিত পরিণতি। কিন্তু রাজ্য চালনার জন্য সম্রাটের বাহু দরকার, অনেক বাহু দরকার, অর্থাৎ এমন সব কর্মচারী দরকার যারা নিজ নিজ সীমিত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়িত্ব যোগ্যতার সহিত পালন করতে পারবে। সিংহাসনে আসীনা যদি রানী এলিজাবেথ, থাকবেন তাঁর কর্মচারী হবেন বার্লে, ওয়ল্‌সিংহাম, তাঁর আদেশে রলে ড্রেক ফ্রবিশর যাবেন দেশে বিদেশে। অর্থাৎ দেশে এক কর্মচারীকুল তৈয়ারি হওয়া দরকার। দরকার শিক্ষার। এইজন্য সেকালে রজার আসকামের বই, কাসটিলিওনির বই, সর্বোপরি মেকিয়াভেলির বই। এইজন্যই অচিরে বেকন লিখবেন জ্ঞানের প্রসার সম্বন্ধে বিশ্লেষণ, লিখবেন নিউ আটলাণ্টিস, নতুন ...তার কল্পনা। আর সেই সমকালীন কল্পনা শেকসপিয়রকে নাড়া দিয়েছিল তার প্রমাণ 'টেম্‌পেসট্‌' নাটকে গন্‌জালোর বিখ্যাত উক্তি যদিও শেকসপিয়র আবার অপরের মারফত গন্‌জালোর কল্পনাবিলাস বিদ্রূপও করেছেন যেন বলতে চাচ্ছেন, 'ঠাট্টা করে ওড়াই সখি নিজের কথাটাই!' ...র এই নেতৃত্ব-প্রত্যয়ের জন্যই ইতিহাসও বিকৃত করেছেন শেকসপিয়র, পঞ্চম হেন্‌রিকে আদর্শ রাজা বানিয়েছেন। তাছাড়া নিজের ...তম শ্রেষ্ঠ শিল্পসন্তান ফল্‌স্টাফকে করেছেন ব্যাহত অপদস্থ মর্মাহত। তাঁর সমকালীন অনেক মনীষীর মতো শেকসপিয়র ইতিহাসে খুঁজেছেন আদর্শ নেতা। রানী এলিজাবেথ তো অবশ্যই, সে যুগের দৃষ্টিতে, সর্ব আদর্শের ললামভূতা, তাঁর ...গাথা শেকসপিয়র গেয়েছেন, যেমন গেয়েছেন লিলি সিডনি স্পেনসর ...ন এবং আরো অনেকে, গেয়েছেন মামুলি রাজপ্রশংসার উদ্দেশ্যে নয়, অন্তরের বিশ্বাস ও তাত্ত্বিক নিশ্চয়তা থেকে। শেকসপিয়রের আদর্শ ইংরেজ রাজা প্রাক্তন ইতিহাসে পঞ্চম হেন্‌রি, রোমের ইতিহাসে অকটেভিয়স সীজার।

এই সঙ্গে আরেকটি ধারণা বিধৃত, যে-ধারণা সম্বন্ধে উপরে তৃতীয় অনুচ্ছেদে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়েছি। সেখানে আর্ডেন-উপবনের উল্লেখে বলেছি ষোল শতকের একটি কামনার কথা, হৃদয়ের আকাঙ্খিত দেশের কথা। এ হেন আকাঙ্ক্ষা জাতির বা ব্যষ্টির কর্মহীন অলস মুহূর্তে আসে না। আসে কর্ম-নিষ্ঠ দায়িত্ব-ব্যাকুল নিরলস মুহূর্তে, যখন মানুষ কাজের নেশায় মাতাল, কাজ করছে তো করছেই, কাজ সে ছাড়বে না, তবুও মাঝে মাঝে যেন কোন্ সুদূরে ...র দৃষ্টি পাঠিয়ে দেয়, আবার তারই পরে কাজে লেগে যায়। Public duty

ও private repose এর দুই সুতো এলিজাবেথীয় কর্মী মানুষের মধ্যেও ছিল, তার আভাস শেকসপিয়র নাটকে। কিন্তু আসল সুতো বড়ো শক্ত সুতো, কর্মের সুতো। ফিলিপ সিড্নি আর্কেডিয়ার স্বপ্ন দেখছেন, দেহত্যাগ করছেন রণক্ষেত্রে। মার্লো 'হীরো অ্যাণ্ড লীয়ণ্ডার' কাব্যে প্রেমের বিস্রস্ত আলস্য বর্ণনা করছেন কিন্তু তাঁর জীবন কর্মে ভরা। শেকসপিয়র প্রায় কুড়ি বৎসর গড়ে বছরে দুখানা করে নাটক রচনা করলেন আর সুযোগ পেলেই চলে গেলেন স্ট্র্যাটফোর্ডের ছায়াচ্ছন্ন কূজনমুখর শিথিল জীবনে। স্ট্র্যাটফোর্ড ও লণ্ডন্ যেন দুই পরিপূরক প্রতীক।

কিন্তু তবুও এলিজাবেথী যুগে কর্মই প্রধান। যে প্রস্পেরো গ্রন্থনিবিষ্ট সংসার-উদাসী, বিচিত্র অভিজ্ঞতার অন্তে তিনিও জাদুদণ্ড ভেঙে ফেলে চললেন আবার কর্মের জীবনে।

বস্তুতঃ এই কর্মের উন্মাদনা ছিল বলেই শেকসপিয়রের কালে নাটক হয়েছিল শ্রেষ্ঠ বাণীশিল্প। যত 'কবিত্বই' নিজ প্রকৃতিতে লেখকেরা অনুভব করে থাকুন না কেন, তাঁদের শিল্পশক্তি নাটকের কর্মস্রোত-লীলায়িত জীবনের বঙ্কিম পথে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমার বিশ্বাস মার্লো এবং ওয়েবস্টার মূলতঃ কবিপ্রকৃতির লোক, বেন্ জন্সনের মতো নাট্যপ্রকৃতির নয় কিন্তু যুগধর্মের অবশ্যমান্য নিয়মে এঁরা হয়েছিলেন নাট্যকার। শেকস্পিয়র-চরিত্রে নিভৃত-লোকবাসী কবি ও বহিরাশ্রয়ী নাট্যকার উভয়ে মিলিত হয়ে জনোল্লাসমুখর প্রেক্ষাগৃহের অদম্য উন্মাদনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। শেকসপিয়রের কাল নাট্যসাহিত্যের কাল কেন না সমসাময়িক ইতিহাস নিরলস কর্মের ইতিহাস।

কিন্তু কর্মের জগতে উত্থান পতনের নিত্যলীলা চলে। কোন্ অজ্ঞাত ভাগ্য বিপর্যয়ে নেতৃত্ব বদলায় (শেকসপিয়র ও তাঁর সমকালীনেরা জানতেন স্বদেশের ইতিহাসে নেতৃত্ব কতবার বদলেছে, সেদিনও স্কট রাণী মেরীর ভাগ্য-বিপর্যয় হয়েছে, লেস্টারের আর্ল ও এসেক্সের আর্ল উত্থানের শিখরে পৌঁছে পতনের গহ্বরে নেমেছেন), কোন্ অনির্ণেয় শক্তির অরোধ্য আঘাতে ব্যক্তির জীবন প্রসন্ন হয় আবার ধূলিসাৎ হয়, কে বলবে ? অতএব শেকপিয়রের কালে Mutability অর্থাৎ পরিবর্তনশীলতা, ভাগ্য, একটি পুনরাবৃত্ত ধারণা। স্পেন্সার তো এই নিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন, শেকসপিয়রে এই ভাগ্যের ধারণা প্রতিটি ঐতিহাসিক ও রোমান নাটকে, আবার এই ধারণা দ্বারা শেকসপিয়র যে ক্লিষ্ট ছিলেন না তার প্রমাণ :

Rosalind. What shall be our sport, then ?

Celia. Let us sit and mock the good housewife fortune from her wheel, that her gifts may henceforth be bestowed equally.

Ros. I would we could do so ; for her benefits are mightily misplaced ; and the bountiful blind woman doth most mistake in her gifts to women.

(*As You Like It*)

এখানেও সেই 'ঠাট্টা করে ওড়াই সখি নিজের কথাটাই।'

শেকসপিয়রের যুগে একদিকে যদি অনতিক্রম্য ভাগ্যের ধারণা, তাহলে তুলাযন্ত্রের অন্য পাল্লায় অপরাজেয় মানবাত্মায় বিশ্বাস, এবং দুই ভিন্নমুখী শক্তির সংশ্লেষ ও সংঘর্ষের ফলেই ব্যক্তির জীবনে কমেডি ও ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়। কমেডি ও ট্র্যাজেডির ধারণা এলিজাবেথী যুগে কী ছিল, তারও পূর্বে মধ্যযুগে এবং তারও পূর্বে গ্রীকো-রোমান যুগে কী ছিল, শেকসপিয়রে তার বিশিষ্ট রূপ কী, এসব জটিল বিষয়ে আলোচনা এই সাময়িকী প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়, আর এসব বিষয়ে জ্ঞানী আলোচনা এ-যাবত অনেক হয়েছে। আমার মূল বক্তব্য যে শেকসপিয়র-কালে কমেডির অথবা ট্র্যাজেডির যে-ধারণা সক্রিয় ছিল সে-ধারণার পশ্চাতে সমকালীন জীবনদর্শন অনেকাংশেই দায়ী। আজকাল আমরা জেনেছি যে হবস্ লক্-এর আগেই শেকসপিয়রের কালে সাইকলজির আলোচনা হয়েছিল। মধ্যযুগীয় Four Humours এর ধারণা ক্রমে জটিল মনস্তত্ত্ব ও শারীর বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ সংস্কার থেকে উন্নীত হল সূক্ষ্ম চরিত্র-বিশ্লেষণে। কেন লোকের চরিত্র বিশেষ ধরনের হয় ? মধ্যযুগে বিশ্বাস করা হত যে প্রত্যেকেরই চরিত্রে vertu (আধুনিক virtue নয়) বিদ্যমান, তারই প্রভাবে মার্লোর চরিত্রেরা নেশাগ্রস্তের মতো একেকটা প্রচণ্ড দুর্দমনীয় বাসনার পিছনে ছুটছে। শেকসপিয়রের কালে এই প্রচণ্ড বাসনার, এই violent passion-এর, সূক্ষ্মতর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া হল। বার্টনের 'অ্যানাটমি অব্ মেলাংকলি', শেকসপিয়রের 'হ্যামলেট', ডানের আত্মবিশ্লেষী কবিতাগুলি, এই নব মনস্তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এই মনস্তত্ত্বের মহৎ দান মানুষের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস। মধ্যযুগে ব্যষ্টির মূল্য ছিল অতীব ক্ষীণ। এখন মানা হল যে ভাগ্যে সুখ থাক বিষাদ থাক বিনাশই থাক, ভাগ্যের আলোড়নে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। এই কথা যখন মানা গেল তখন বিস্ময় জাগল ব্যক্তিত্বের ভাবনায়।

যেন নতুন এক পৃথিবী আবিষ্কৃত হল। যে-রেনেসাঁসের গোড়ার কথা নবহবোধ, বিস্ময়, যে-রেনেসাঁস প্রাচীন বিত্থার পুনরুদ্ধার করে', নূতন ভূখণ্ডের আবিষ্কার করে' বিস্ময়মগ্ন হয়েছিল, সেই রেনেসাঁস এখন অন্য এক মহাদেশ আবিষ্কার করল—মানবচিত্ত। আর এই মহাদেশ যেন নিত্য নতুন বিস্ময় আমাদের সামনে সাজাল! বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াচ্ছেন না শেক্স্পিয়র অথবা সমকালীন অন্য কোনো লেখক, দাঁড়াবার সময় নেই কেননা জীবন তো দ্রুত ধাবমান, কিন্তু সেই তড়িদ্গমনের সঙ্গেই শেক্স্পিয়র লক্ষ্য করছেন মানবচিত্তের অগণিত প্রকাশ। এই তো রেনেসাঁসের বিস্ময়, রেনেসাঁস মানলো ব্যক্তির চেয়ে অধিক অভিনব কিছু নেই। এই বিস্ময়েরই অবিস্মরণীয় প্রকাশ হ্যামলেটের ও মিরাণ্ডার উক্তিতে, তাছাড়া কত যে ছোটখাট আরও উক্তিতে ছড়িয়ে আছে—কী শেকসপিয়রের লেখায়, কী অপরের—তার হিসাব নেই। কীট্স্ তাঁর সনেটে মেক্সিকো-জয়ী কর্টেসের কথা বলেছেন, পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে কর্টেস্ দেখলেন ওপারে অনন্ত সাগর, অনাবিষ্কৃত পৃথিবী, আর তাঁর চিত্ত ভরে গেল অপার বিস্ময়ে। শেকসপিয়রের যুগে প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন একেকটি কর্টেস—অপার বিস্ময়ের মালিক, অনলস কর্মী, পুরুষকার-প্রত্যয়ী আবার ভাগ্যেরও বিরোধী নন, ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী।

ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস থাকলেই একটি মূল্যবান অনুসিদ্ধান্তে পৌছতে হয়। শেকসপিয়র-কালে এই অনুসিদ্ধান্ত অতিশয় সক্রিয়, তাঁর সাহিত্যচিন্তায়ও সক্রিয়। এই সিদ্ধান্তে নেচার ও আর্টের তারতম্য করা হয়েছে। জীবনের কতটুকু স্বতস্ফূর্ত, কতটুকু শিল্পায়িত, স্বতস্ফূর্তিই কি মানুষের কাম্য না সব কিছুই শিল্প দ্বারা রূপায়িত সংযত হওয়া দরকার? যদি ব্যক্তিকে মানি, আর মানি যে ব্যক্তি কর্মশীল, তাহলে কর্মও মানতে হবে। বস্তুতঃ সমগ্র রেনেসাঁস-সাহিত্যে নেচার ও আর্টের দ্বৈততা, শেষ বিচারে আর্টের শ্রেষ্ঠতা, পুনঃপুনঃ বর্ণিত হয়েছে। এই দুইয়ের দ্বৈততার শ্রেষ্ঠ বাণীপ্রকাশ, আমার যতটুকু জানা আছে, শেকসপিয়রের 'টেম্পেস্ট্' নাটকে এবং মিল্টনের 'কোমাস্' নাটকে। মিলটনে পশুশক্তির রূপক কোমাস বলছে সংযমবিহীন ভোগের কথা, সংস্কৃতিবান নারী বলছেন সংযত সমাজ-সচেতন স্বমিত ভোগের কথা। মিল্টনের সহানুভূতি অবশ্যই নারীর দিকেই। শিক্ষা ও স্বভাব, সংযম ও অবাধ প্রবৃত্তি এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব শেকসপিয়রের নাটকে ('উইন্টার্স টেল', 'সিম্বেলিন', 'কিং লীয়র' ও অন্যত্র) ও সে-যুগের অন্য সাহিত্যে কী ভাবে

প্রকাশিত হয়েছে, এই দ্বন্দ্বের মানসিক পশ্চাৎপট কী সে বিষয়ে ইদানীং বহু আলোচনা হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক 'টেম্পেস্ট্' নাটকের নব-আর্ডেন সংস্করণ পাঠে এই চিন্তার পরিচ্ছন্ন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাবেন।

শেকসপিয়র শিক্ষায় শিল্পে বিশ্বাস করতেন, নিরেট প্রবৃত্তিতে বিশ্বাস করতেন না। এ বিষয়ে তিনি পুরোপুরি স্বকালবদ্ধ। শিল্প মানে অস্কার ওয়াইল্ড্-এর স্বয়ম্ভূ শিল্প নয়, এই শিল্প জীবনেরই সংস্কৃত রূপ। শিল্প মানতেন বলেই তাঁর শিল্প নিয়ত প্রত্যক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেছে, প্রত্যক্ষকে বর্ণায়িত করেছে। শেকসপিয়রের জগৎ নিষ্ঠার সঙ্গে, প্রেম দিয়ে, সমকালীন জগতের ভিত্তিতে আপনাকে দাঁড় করিয়েছে বলেই সে-জগৎ মহৎ শিল্প এবং তার আকৃতি সার্বজনিক।

সাত

যে কয়েকটি প্রত্যয়ের বর্ণনা করেছি সেই কয়টিতেই শেকসপিয়রের সমগ্র চিন্তাচক্র সমাপ্ত হয়েছে এমন হাস্যকর অবিবেকী দাবী করব না। আমার প্রয়াস খুবই সীমিত ও বিনীত। সমকালীন যে নৈসর্গিক, সামাজিক ও মানসিক পরিমণ্ডলে শেকসপিয়র জীবন কাটিয়েছেন, সেই পরিমণ্ডল থেকে কয়েকটি প্রত্যয় ও কিছু ধারণা পেশ করেছি যেগুলি তাঁর শিল্পী চিত্তে সঞ্চারিত হয়েছিল। এসব প্রত্যয় তাঁর যুগের, আবার তাঁর নিজেরও। সর্বক্ষেত্রেই যে শেকসপিয়রের নিজ প্রত্যয় ও তখনকার যুগপ্রত্যয় সমতুল্য ছিল এমন নয়। সেকালে অনেকের ধর্মচিন্তা ছিল গোঁড়ামিতে ভরা। শেকসপিয়র অবশ্যই খৃষ্টধর্মে বিশ্বাস করতেন কিন্তু গোঁড়ামিতে ভোগেন নি, বরঞ্চ পিউরিটান সম্প্রদায়ের গোঁড়া খৃষ্টানদের অপছন্দই করতেন। অপরপক্ষে, তাঁর শেষ নাটকগুলিতে যে ক্ষমা-প্রেম-মৈত্রী-মিলনের অনুপ্রেরণা নিহিত, সে-অনুপ্রেরণা মুখ্যতঃ যীশুর মহান উপদেশ থেকে উৎসারিত সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু সে-প্রেরণা সর্বমানবিকও বটে। শেকসপিয়রের উপলব্ধি বিশেষ ধর্ম, বিশেষ উক্তি, বিশেষ কাল ছাড়িয়ে সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের জন্য ক্ষমা-প্রেম-মৈত্রী-মিলনে প্রত্যয়ী হয়েছিল। অন্য কোনো সমকালীন নাট্যকারে এই প্রেরণা ও প্রত্যয় পাই না যদিও তাঁরা সকলেই শেকসপিয়রের মতোই খৃষ্টান ছিলেন, হয়তো সমাজের চোখে তাঁদের কেউ কেউ বেশি খাঁটি খৃষ্টানই ছিলেন। কিছু প্রত্যয় শেকসপিয়র পেয়েছিলেন তৎকালীন বহু-আলোচিত চিন্তা থেকে,

এহেন কয়েকটি প্রত্যয়ের আভাস উপরে দিয়েছি। ধরা যাক আরেকটি প্রত্যয় : ভূমা ও অণুর সম্পর্ক, macrocosm ও microcosm সংক্রান্ত চিন্তা। সে যুগের একটি সুপরিচিত চিন্তা এখানে। Cosmos বা ব্রহ্মাণ্ড দুই ভাবে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করতে পারে : আব্রহ্ম স্তম্ব বিশাল বিশ্বে যে প্রকৃতি, যে নিয়ম, যে ছন্দ, তার সবই বিধৃত হতে পারে একটি ক্ষুদ্র সত্তায়, ধরুন একটি মানব সত্তায়। মানুষের দেহে সেই প্রকৃতি ও নিয়ম লক্ষ্য করতে পারি যা করেছি বিশাল সৌরজগতে। তাহলে macrocosm ও microcosm-এ বিশ্বলীলার ছন্দ অভিন্ন যদিও তাদের অবয়বে ও আয়তনে প্রচণ্ড প্রভেদ। ভূমা ও অণুর এই বিচিত্র সম্পর্ক নিয়ে দু-চার কথাও বলেন নি এমন লেখক ষোল শতকে পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে শেকসপিয়রের প্রত্যয় বিশেষভাবেই ষোল শতকী প্রত্যয়। এসব প্রত্যয়ের সম্ভারে শেকসপিয়র স্বকালমগ্ন পুরুষ, তাঁর নিজ যুগে তিনি সমাস্ত, সীমিত। আরো দশজন সমকালীন লেখকের চিন্তা ও তাঁর চিন্তা অভিন্ন। পক্ষান্তরে এমন প্রত্যয় শেকসপিয়রে প্রতিভাত যা' কিনা নেহাৎ যুগধর্মপ্রসূত নয়, যেখানে তিনি ইতিহাসে বিলুপ্ত নন, সে সব প্রত্যয় সর্বকালীন, সেখানে তিনি চিরন্তনের সংকেত-সন্ধানী। সমকাল ও সর্বকাল, মহাকালের এই দুই রূপ শেকসপিয়র-চিন্তায় স্বাক্ষর রেখেছে। এই দুই রূপের বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ, সংযোগ ও ব্যবধান, প্রণিধান করা শেকসপিয়র-প্রেমীর কর্তব্য, যদিও দুরূহ কর্তব্য। বর্তমান প্রবন্ধে আমি কেবল সমকাল-চিন্তারই কিছু আভাস দিয়েছি।

যদিও 'প্রত্যয়' শব্দটি বারংবার ব্যবহার করছি তবুও সংশয় হয় শেকসপিয়রের কল্প জগতের গভীরতম কন্দরে এই শব্দটি সুপ্রযুক্ত কিনা। সমকালের হোক, সর্বকালের হোক, কোনো চিন্তাই কি শেকসপিয়রে ধ্রুব, অপরিবর্তনীয়, অনমনীয় ছিল? জীবনের মূল্য সম্বন্ধে শেকসপিয়র কি কখনোই প্রস্তরস্থির সিদ্ধান্ত করে বসেছিলেন? শেকসপিয়র কী ভাবতেন সে-বিষয়ে কোনো তথ্য প্রমাণই আমাদের আয়ত্তে নেই, তাঁর রচনাবলী ছাড়া. অতএব সে-বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হয়ে কোনো রায় দেওয়া যায় না, আমরা কেবল সপ্রেম অধ্যয়ন-সঞ্জাত নিজ অনুভূতির কথাই বলতে পারি। বলতে পারি যে শেকসপিয়রের জীবনে প্রত্যক্ষ ও মানসিক অভিজ্ঞতা অবশ্যই ছিল প্রচুর ও বিচিত্র, তবুও (তাঁর রচনাবলী বারংবার অধ্যয়ন ও তাঁর নাটক বহুবার মঞ্চস্থ দেখার ফলে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে) তাঁর নিবিড়তম অচ্ছেদ্যতম অভিজ্ঞতা

ছিল রঙ্গমঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ। থিয়েটার যেন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ জগৎ, বহির্জগতের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র জগৎ কিন্তু সেখানে বহির্জগতেরই প্রতিকৃতি, প্রতিচ্ছায়া। এই জগতের বাসিন্দা থিয়েটারের লোক—লেখক, অভিনেতা, ম্যানেজার, স্বত্বাধিকারী, প্রযোজক, সজ্জাকার, আরো কত কর্মচারী। শেকসপিয়র লেখক ছিলেন, ছিলেন অভিনেতা, আবার অংশের মালিক। এই থিয়েটারে তিনি জীবিকা অর্জন করতেন, এই থিয়েটারেই তিনি সাজতেন (হয়তো 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'-এর অ্যাডাম অথবা হ্যামলেটের পিতার প্রেত), এই থিয়েটারেই তাঁর কল্প জগৎ রূপায়িত হত অপরাহ্নের পরে অপরাহ্ন। ইয়েট্‌স্ যাকে বলেছিলেন this theatre business, the management of men, সেই সংগঠনী দায়িত্ব যেমন তাঁর ছিল, তেমন আবার এই থিয়েটারেই তাঁর সৃজনী প্রতিভা পেয়েছিল প্রকাশপথ। একেকটি নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পরে, অপরাহ্ন-শেষে মঞ্চ থেকে মানস-সন্তানগুলি কোন্ অন্ধকারে মিলিয়ে যায় যতদিন না আবার নাটকটি মঞ্চস্থ হয়! কোথায় অদৃশ্য হয় জুলিয়েট, পোর্শিয়া, জাস্টিস শ্যালো, হ্যামলেট, লিয়র, অ্যাণ্টনি! কোথায় উড়ে গেল প্রায়-স্বতোৎসার স্বচ্ছ তীব্র কল্পনামথিত মৃত্যুহীন কাব্যছত্রগুলি! আর কোথায় মিলিয়ে গেল সেই সব মেধাবী প্রত্যয়গুলি যেগুলি আহরণ করা হয়েছিল সমাজচিন্তা ও দার্শনিক আলোচনা থেকে, নিজ জীবন বীক্ষা থেকে! শেকসপিয়রের কি মনে হয়নি যে রঙ্গমঞ্চ একটা নিত্য কুহেলি-আচ্ছন্ন রূপক? শেকসপিয়রের গণনযোগ্য নয় এমন এক লেখক, প্রীসট্‌লি, তাঁর 'জেনি ভিলিয়ার্স' নামক উপন্যাসে অভিনেত্রী পলিন ক্রেজারের কাছে অভিনেতা মার্টিন চেভেরিলকে বলাচ্ছেন :

> I believe now that in our life, as in the theatre, the scenery and costumes and character make-ups and props are only a shadow show, to be packed up and put away when the performance is over. And what is real, indestructible and enduring is all that so many fools imagine to be flimsy and fleeting—the way an honest artist sees his work—the root and heart of a real personal relationship—the flame. Yes, the flame burning clear.

আর শেকসপিয়র নিজে তাঁর রচনায় বারংবার এই রূপকের আশ্রয় নেন নি

কি, বারংবার কি বলেন নি, মানুষের জীবন যেন একটা অভিনয়, একটা খেলা-খেলা আত্ম-অবলোপ, একটা মুখোশ, একদিন অন্য সত্তায় নিজ সত্তা বিলিয়ে দেওয়া আবার অন্যদিন অন্য এক নূতন সত্তায় নিজকে সাজানো? তাহলে নিজের আসল সত্তা কোথায়? কত ভাবে এই রূপক দেখা দিয়েছে শেকসপিয়রের কাব্যে! "টেম্‌পেস্ট"-এর বিখ্যাত ছত্র সর্বজনবিদিত:

the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve,
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind.

একটা pageant, মিছিল, এই জীবন, কিন্তু সেই মিছিলও এক মায়াময় রহস্য, ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, তাকে ধরতে গেলে মিলিয়ে যায়। একই বাক্-প্রতিমা প্রযুক্ত হয়েছে অ্যান্টনির উক্তিতে:

Sometime we see a cloud that's dragonish;
A vapour sometime like a bear or lion,
A tower'd citadel, a pendant rock,
... ...
They are black vesper's pageants.
... ...
The rack dislimns, and makes it indistinct
As water is in water.

শেকসপিয়র জানতেন যে কিছুই আয়ত্তে আনা যায় না, কিছুই জানা যায় না, প্রত্যয় ও অপ্রত্যয়ের সীমানা অনির্ণেয়। তিনিও জানতেন যেমন বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সৃজনী প্রতিভা জেনেছিলেন যে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় বহু-উচ্চারিত প্রশ্ন আবার তোলা যায়, কে তুমি, কিন্তু মেলে না উত্তর। শুধু জানা যায় যে অনেক প্রত্যক্ষের ও প্রত্যয়ের, অনেক মনীষার ও আবেগের, অনেক দর্শনের ও শ্রবণের ও মননের ও পারে ঝিলিক দেয় এক অপরূপ মায়াময় রহস্য।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

উইল শেক্সপীয়র : একটি কল্পনা

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

প্রথম দৃশ্য

[শেক্সপীয়রের বাড়ি। অনাড়ম্বর সাজানো ঘর কিন্তু সর্বত্র রুচির ছাপ আছে। পেছনের দেওয়ালে ঠিক মাঝখানে পৃথিবীর মানচিত্র ঝুলছে। দেওয়ালে আর দু-একটি তৈলচিত্র। ঘরের কোণে ছোট খাট। ঝালর-দেওয়া বেডকভারে বিছানা ঢাকা, খাটের মাথার দিকে ছোট টিপয়—তাতে ফুলদানিতে কিছু ফুল। সেণ্টার স্টেজে টেবিল—তার ওপরে কাগজপত্র স্তূপাকার। টেবিলের ধারে দু-তিনটি ওক কাঠের চেয়ার। শেক্সপীয়র বসে আছে, হাতে পাণ্ডুলিপি। মার্লো ওর চেয়ারের হাতলে বসে, এক হাতে শেক্সপীয়রের গলা জড়িয়ে ওর হাতের পাণ্ডুলিপি পড়ছে।]

শেক্স : আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। তুমি কেমন করে সৃষ্টি করো আমি অবাক হয়ে দেখি! সারাদিন জুয়া খেলে কাটাও···রাত্রে সুরা আর নাচ—কখন তুমি লেখো এসব—কেমন করেই বা লেখো?

মার্লো : পছন্দ হয়েছে তোমার?

শেক্স : পছন্দ হয়েছে। কী বলছো তুমি? সাগর-পারে সামগানের গাম্ভীর্য নিয়ে যখন সূর্য ওঠে—বৃষ্টি-ভেজা আকাশে যখন রামধনুর দীপ্তি ঝলমল করে—সূর্যের আলো যখন তুষারধবল গিরিশৃঙ্গকে সোনালী আবির মাখিয়ে দেয়—তখন কি নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হয় ভালো লেগেছে কিনা!

মার্লো : তুমি আমাকে লজ্জা দিলে উইল! যাক ওসব কথা, তোমার সীনটা কতদূর হল?

শেক্স : আমার সিন! আমার দেওয়ার পালা শেষ হয়েছে। সব রস আমার কে যেন নিঙড়ে নিয়েছে। এ নাটক তোমায় একাই শেষ করতে হবে কিট্।

মার্লো : ও কথা আমি আগেই শুনেছি।

শেক্স : মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যদি লণ্ডনে কোনোদিন না আসতাম!

মার্লো : হেন্‌স্‌লো ফিরে এসেছে। দেখা হয়েছে?

শেক্স : আমার কারো সঙ্গে দেখা হয় নি। ওদের ট্যুর ভালো হয়েছে?

মার্লো : বললে তো ভালোই হয়েছে। ও অবশ্য ষ্ট্র্যাটফোর্ডে ওদের ছেড়ে এসেছে।—আমায় কিন্তু এবার যেতে হবে।

শেক্স : কোথায়? মেরীর কাছে?

মার্লো : তোমার মেরীর কাছে আমি কেন যাব?

শেক্স : কেন আবার? আমি তোমায় অনেকবার বলেছি বলে। তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে—তুমি ইচ্ছে করলে আমায় সাহায্য করতে পারতে।

মার্লো : কোনো পুরুষ ও নারীর মাঝখানে থাকা বিপজ্জনক!

শেক্স : কিন্তু তুমি আমাদের বন্ধু! আর লোকে বলে তুমি নারীচরিত্র ভালো বোঝো!

মার্লো : লোকে অনেক কথা বলে। তারা বলে আমরা নাকি প্রতিদ্বন্দ্বী—আমি নাকি ঠিক একদিন তোমাদের সর্বনাশ করব।

শেক্স : যে যা বলে বলুক; আমি চিন্তা করি না। তুমি মেরীকে শিগ্‌গির দেখেছ? শেষ কবে দেখা হয়েছে?

মার্লো : মনে নেই। বোধ হয়…গত শনিবার।

শেক্স : তুমি আমার কথা বলেছ মেরীকে? ও কিছু বলল আমার কথা?

মার্লো : একান্তই যদি জানতে চাও—প্রায় কিছুই নয়।

শেক্স : আমি তিনদিন দেখিনি ওকে।

মার্লো : বেশ তো যাও, দেখা করো গিয়ে।

শেক্স : যখনই যাই শুনি ব্যস্ত। ওর নানান কাজের ভিড়ে একটি দুটি মুহূর্তের বেশি আমার জন্য থাকে না। তখনো মাপা হাসি, দুটি আঙুল এগিয়ে দেয়…তারপরেই "বিদায় মিঃ শেক্সপীয়র।" কিন্তু

মাত্র একমাস আগে…হ্যাঁ একমাস আগেও—! আমার চিঠি দিয়েছিলে ওকে? কী বলল ও?

মার্লো : পড়ে হাসল আর বলল তুমি স্বপ্ন দেখছ।

শেক্স : তার মানে?

মার্লো : মেরী বলতে চায় তুমিই ওকে অবহেলা করো, ও নয়।

শেক্স : এই কথা বলল? কী জানি কথাটা সত্যি হলে ভালো লাগত। যাক—মার্লো আমার কাছে তোমার ধন্যবাদ পাওনা রইল।

মার্লো : ও সব থাক।

শেক্স : কিট্, তুমি কি আমাকে খুব ঘৃণা করো?

মার্লো : ঘৃণা? ঘৃণা করতে যাব কেন তোমায়?

শেক্স : আমি লণ্ডনে—ষ্ট্র্যাটফোর্ডে নয় বলে।

মার্লো : আমি বিচার করি না। কোনো খবর পেয়েছ?

শেক্স : না। আর খোঁজ নিতেও ভয় হয়। আমার ছেলে নিশ্চয়ই মারা গেছে। আমি জানি। কিন্তু ও খবর আমি শুনতে পারব না। মার্লো, মার্লো; তুমি নিশ্চয় আমাকে বিচার করছ?

মার্লো : আমি কেন তোমার বিচার করতে যাব! আমি নিজে যা ইচ্ছে হয় তাই করি—তার জন্য নরকে যেতে হলেও আমি রাজী। তোমায় কেন দোষ দিতে যাব? মেরীর মতো আশ্চর্য মেয়ে—বিশেষত তোমার মতো দেখার চোখ থাকলে—কটা মেলে পৃথিবীতে? আমার যা কাম্য বস্তু তার জন্য মূল্য দিতে হবে আমাকে।

শেক্স : সত্যি বলছ কিট্?

মার্লো : সত্যি বলছি, উইল।

শেক্স : বিশ্বাস, নীতিবোধ; একমাত্র সন্তান—এতো বড়ো মূল্য? অবিশ্যি আমি আমার পাওনা চুকিয়ে দিয়েছি!

মার্লো : কিন্তু তুমি তার জন্য অনুতপ্ত! নিজের অবস্থা কি হয়েছে দেখেছ? এই চেহারা নিয়ে মেরীর কাছে গেলে খুবই স্বাভাবিক সে ক্লান্তিবোধ করবে।

শেক্স : ক্লান্তি? কি বললে? ও ক্লান্তিবোধ করে? কে বললে?

মার্লো : না না, সে-কথা আমি বলি নি, উইল! আমি কেন বলতে যাব সে-কথা? উইল, উইল।

শেক্স : (উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে) আমি সারারাত ঘুমোতে পারি না, কিট্? এক লাইন লেখা বেরোয় না আমার। এ আমার কী হল? মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাব! (চমকে উঠে) সিঁড়িতে ঐ ছেলেটা? মেরীর কাছে পাঠিয়েছিলাম চিঠি দিয়ে। আমি জানি মেরী আমার সঙ্গে খেলা করছে। কিন্তু আমি আর পারছি না। আজ রাতে ওর দেখা পেতেই হবে। তুমি চলে যাচ্ছ, কিট্?

মার্লো : আর দেরী করলে ডেপ্টফোর্ডে পৌছতে রাত হয়ে যাবে।

শেক্স : ডেপ্টফোর্ডে তুমি কতদিন থাকবে?

মার্লো : পুরো গ্রীষ্মটা।

হেন্স্ : (দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে) বাড়িতে কে আছ? বাড়িতে কে আছ?

মার্লো : হেন্স্‌লো এসেছে।

শেক্স : ছেলেটা এত দেরী করছে কেন?

হেন্স্ : ভদ্রমহোদয়গণ, পথিক গৃহে প্রত্যাগত! আমি এলাম, আর তুমি চললে, কিট্? যাক তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে হল না বলে ধন্যবাদ!

মার্লো : আমায় খাতির করো হেন্স্‌লো! আমার আসছে নাটক তোমায় বড়লোক করে দিতে পারে!

হেন্স্ : আরে যাও! এই লোককে দিয়েই আমার কাজ চলবে।

মার্লো : আমি তোমাকে বলেছিলাম, উইল, এরা আমাদের দুজনের ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে ছাড়বে। শিগ্‌গিরই আবার দেখা হবে।

[বেরিয়ে যায়]

হেন্স্ : তারপর, খবর কী বলো।

শেক্স : আমি ঘরে বসে আছি, তুমি গোটা ইংল্যাণ্ড ঘুরে এলে; খবর তো তুমিই বলবে। ট্যুর কেমন হল, বলো।

হেন্স্ : তুমি ভীষণ রোগা হয়ে গেছ। কী ব্যাপার?

শেক্স : ট্যুর কেমন হল?

হেন্স্ : অক্সফোর্ডে একরাত থেকে ওয়ারউইক; কেনিলওয়ার্থ—

শেক্স : কেমন হল জিজ্ঞেস করছি, কোথায় নয়।—

হেন্স্ : —লিমিংটন, সবশেষে স্ট্র্যাটফোর্ড। প্রত্যেক জায়গায় রোমিও-জুলিয়েট করেছি, হল ফেটে পড়েছে। সবার তোমাকে পছন্দ। আর তোমার শহরের লোকেরা তো পাগল হয়ে উঠেছে।

শেক্স : স্ট্র্যাটফোর্ডে কি তুমি অনেকদিন ছিলে?

হেন্স্ : দু-দিন।

শেক্স : কাউকে···দেখেছ?

হেন্স্ : সোজাসুজি জিজ্ঞেস করো না—

শেক্স : আমার বাড়ির কাছে গিয়েছিলে?

হেন্স্ : তোমার বাড়ির পথ ভুলে গিয়েছিলাম।

শেক্স : যেমন আমি ভুলে গিয়েছি।

হেন্স্ : গেলে ভালো হত?

শেক্স : না।

হেন্স্ : তবু আমি গিয়েছিলাম। লণ্ডনে আসার জন্য ঘোড়ায় চেপে মনে হল এ যেন কত চেনা পথ। আনমনে এক গলির মধ্যে ঢুকে হঠাৎ দেখি তোমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছি; দশটা বছর তোমার বাড়ির গেটের সামনে এক মুহূর্তে যেন মিলিয়ে গেল।

শেক্স : দশ বছর!

হেন্স্ : কিচ্ছু বদলায় নি···সেই ছোট্ট বাগানটি রোদ মেখে চুপ করে ঝিমোচ্ছে···গোটা বাগান ভরে অজস্র গোলাপ···মৌমাছিরা গুনগুন করে দূর থেকে ভেসে আসা স্কাইলার্কের গান ডুবিয়ে দিয়েছে···

শেক্স : তুমি ভেতরে গিয়েছিলে?

হেন্স্ : চুপিচুপি পা টিপে টিপে গেলাম জানলার ধারে···ভেতরে তাকালাম—

শেক্স : কি দেখলে?

হেন্স্ : দেখলাম ওকে—একটা বাচ্চাদের চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে, ঠোঁট দুটি শুধু কাঁপছে—মনে হল তোমার নাটকের একটা গান গুনগুন করে গাইছে···

শেক্স : অনেক বদলে গেছে?

হেন্‌স্‌ : আমার চিনতে অসুবিধে হয় নি। আমি জানলায় টোকা মারতে 'উইল' বলে দৌড়ে ছুটে গেল দরজার দিকে···চুল উড়ছে···উদ্‌ভ্রান্ত চোখ দুটি···দরজা খুলে আমাকে দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল···যেন শীতের পাতাঝরা গাছ—

শেক্স : তারপর ?

হেন্‌স্‌ : আমি জিজ্ঞেস করলাম আমাকে চিনতে পেরেছ কিনা। বললে 'হ্যাঁ' আর জানতে চাইল আমি কিছু খাব বা বিশ্রাম করব কিনা। আমি তোমার কথা বললাম ; ও চুপ করে শুনে গেল।

শেক্স : কোনো প্রশ্ন করল না ?

হেন্‌স্‌ : একটিও না ?

শেক্স : কোনো কথা বলল না ?

হেন্‌স্‌ : না। আমি চলে আসার আগে জানতে চাইলাম কোনো খবর পাঠানোর আছে কিনা। একটু ইতস্তত করে চুপি চুপি বললে : "বলবেন Shottery-র বনে এখনও বসন্তের মেলা বসে।" "আর কিছু" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "ওকে বলবেন এখনও সেই বুনো গোলাপের ঝোপে ফুল ফোটে।" "কোনো চিঠি বা আর কিছু" বলাতে ও বলে উঠল, "আর ওকে বলবেন এখনকার দিনগুলো বড়ো দীর্ঘ, আর—।" তারপর কথা না শেষ করে হঠাৎ দৌড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

শেক্স : ওঃ হেন্‌স্‌লো। দশ বছর আগে অ্যান্ যদি এরকমটি হত আর আমি যদি এখন যা তাই হতাম—। যাক ওসব কথা, মার্লোর খবর শুনেছ ? তার 'লীথাস্তার'-এর তিনভাগ শেষ হয়ে গেছে ! ওঃ এই মার্লো ; কি আশ্চর্য প্রতিভা !

হেন্‌স্‌ : তোমার নাটক শেষ হয়ে গেছে ?

শেক্স : না।

হেন্‌স্‌ : কতটা হয়েছে ?

শেক্স : এক লাইনও না।

হেন্‌স্‌ : তুমি কি পাগল ? আমরা প্রতিশ্রুত। রানীকে কি বলব আমি ?

শেক্স : যা খুশি তোমার। তুমি নিজে নাটক লেখ। মার্লোকে বা আর কাউকে দিয়ে লেখাও। আমি পারব না। আমি ফুরিয়ে গেছি। রোমিও জুলিয়েটের প্রেতাত্মারা এখনও ঘুরে বেড়ায় আমার চারপাশে, কিন্তু আমি আর ওদের জীবন দিতে পারব না। আমি একেবারে নিঃশেষ হেন্‌স্‌লো।

হেন্‌স্‌ : এই দেখ ! রোমিও-জুলিয়েট আর কে চায় ? নতুন নাটক কোর্টে হবে। ওখানে সবাই চায় হাল্কা সহজ কমেডি। তুমি বুঝতে পারছ না ! ফরাসী রাজদূতাবাস থেকে লোক আসবে, ইটালিরও দুজন আসবে, এছাড়া এসেক্স আর তার দলবল তো আছেই। তুমি তো জান ওদের কি পছন্দ। লক্ষীটি, তাড়াতাড়ি লিখে ফেল ! কি আর এমন শক্ত কাজ ? কয়েক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা ; একটু ঝগড়া, একটু বিরহ ; দু-চারটে চুমু ; দুটো নাচ ; চারটে গান, ড্যাফোডিল, ভ্যালেন্টাইন আর গোলাপের মেলা—ব্যস, এইসব একটা বোতলে পুরে বারকতক ঝেঁকে নিয়ে সবার পাতে দিয়ে দাও। হয়ে গেল তোমার নাটক—যেমনটি রানীর পছন্দ !

শেক্স : হ্যাঁ, "যা তোমাদের পছন্দ !" কিন্তু আমি পারব না। আমি বাঁচতে চাই, লিখতে না। রানীকে বোলো সে কথা।

[একটি কিশোর গুনগুন করে গান করতে করতে ঢোকে]

শেক্স : এই যে, কি খবর হিউ ?

কিশোর : আজ্ঞে কোনো খবর নেই।

শেক্স : কি ? কোনো উত্তর ?

হেন্‌স্‌ : দেখ উইল, তুমি যদি নাটক না লেখ তো আমি সোজা রানীর কাছে যাব। বলে দিলুম তোমাকে !

শেক্স : (কিশোরকে) তুমি কি দেখেছ—?

কিশোর : ঐ ভদ্রমহিলাকে ?

হেন্‌স্‌ : তোমার পাগলামিতে 'রোজ' থিয়েটার চোখের সামনে ডুবে যাবে এ আমি কিছুতেই—

শেক্স : (কিশোরটিকে) আমি তোমায় কি বলেছিলাম ?

কিশোর : আজ্ঞে, আপনি বলেছিলেন দরকার হলে সারারাত মিসট্রেস ফিটনের দরজা-গোড়ায় অপেক্ষা করতে। কিন্তু উনি যে চলে গেলেন—আমি নিজের চোখে দেখলুম ওঁকে। উনি অবশ্য আমাকে দেখেন নি।

হেন্‌স : ও, মেরী ফিটন! এবার বুঝলুম ব্যাপারটা কি!

শেক্স : কি বললে তুমি?

হেন্‌স্ : বলছি যে রানীকে বলতে হবে এই গণ্ডগোলের মূলে কে?

শেক্স : তোমার স্পর্ধা তো কম নয়? একজন ভদ্রমহিলার সম্পর্কে এরকম বলছ!

হেন্‌স্ : উইল, উইল!

শেক্স : বল নি তুমি?

হেন্‌স : উইল, তোমার বন্ধুদের ধৈর্য নিয়ে তুমি বড়ো বেশি টানাহেঁচড়া করো।

শেক্স : তুমি আমাকে ছিবড়ের মতো পথের ধারে ফেলে দিতে পার! কিন্তু সত্যিকারের বন্ধুও আমার আছে—মার্লো আর—

হেন্‌স্ : হুঁ, মার্লো! [শেক্সপীয়র আক্রমণোদ্যত] না উইল, না। আমার বয়স হয়েছে—আমি ঝগড়া করতে চাই না।

শেক্স : তুমি বসে বসে আমার বন্ধুদের কুৎসা করবে আর আমায় তাই শুনতে হবে?

হেন্‌স্ : কুৎসা? শহরের যে-কোনো লোককে জিজ্ঞাসা কর। মোটে একদিন হল ফিরেছি—এর মধ্যেই সব আমার কানে এসেছে। উইল, রাস্তার লোকেরা এই ব্যাপার নিয়ে গান গাইছে!

শেক্স : এই ব্যাপার? কি ব্যাপার?

হেন্‌স্ : এই ছোকরা।

কিশোর : আজ্ঞে?

হেন্‌স্ : সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কি গান গাইছিলি?

কিশোর : আজ্ঞে···মানে···ইয়ে—

হেন্‌স্ : হ্যাঁ, গানটা করত!

কিশোর : আজ্ঞে আমি সবটা জানি না।

হেন্‌স্ : যতটুকু জানিস কর।

কিশোর : আজ্ঞে তাহলে করি—

লাল টুকটুক পদ্মফুল মুখ তুলে ওই চায় রে—
দুই দিকে দুই ভোমরা এসে গুনগুনিয়ে গায় রে ॥
দুইজনে তার পরানবঁধু, দুইজনে চায় ফুলের মধু;
[ফুলের] সোহাগ নিয়ে রেষারেষি চলছে দুজনায় রে ॥
[মাঠের] ভোমরা দুটো নাকাল হয়ে মরছে শুধু ঘুরে হে!
[নটী] পদ্মবালা দুইজনাকেই দিচ্ছে হাসি ছুঁড়ে হে!
একটি ভ্রমর বসলে পাশে, অন্য ভ্রমর মারতে আসে
[ওরে,] কার কপালে ঝুলছে মধু কেউ জানে কি তায় রে?

হেন্‌স্ : কি উইল? বেশ ভালো সুর না? খাসা সুর!

শেক্স : আমার যা ইচ্ছে আমি তাই করব—তার জন্য নরকে যেতে হলেও আমি রাজী।

কিশোর : আমি কি চলে যাব?

শেক্স : যাও! যাও!

কিশোর : আজ্ঞে আমার বকশিস? বিশ্বাস করুন আমি পারলে ওনাকে থামাতাম। এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন! একেবারে অন্যরকম লাগছিল দেখতে—ঘোড়ায় চড়ার পোশাক···আমি কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছিলাম।

হেন্‌স্ : এসব কি ব্যাপার?

শেক্স : (কিশোরকে) তুমি স্বপ্ন দেখছ—

কিশোর : আজ্ঞে না, তাঁর আঙুলে আপনার আংটি দেখলাম—

শেক্স : চুপ কর। এই নাও আর স্বপ্নের কথা ভুলে যাও! (ওকে টাকা দেয়) বিদায় হেন্‌স্! তুমি যা বললে তা যদি মিথ্যে হয় তার দাম দিতে হবে তোমাকে। আর যদি সত্যি হয়—।

হেন্‌স্ : দাম-টাম আর আমি বুঝি না। আমার শুধু চাই রানীর ফরমায়েশী নাটক! শেষ পর্যন্ত আমি তা পাবও। রানীকে তুমি এখনও চেন নি!

শেক্স : হিউ!

কিশোর : আজ্ঞে?

শেক্স : কোনদিকে গেল সে?

কিশোর : আজ্ঞে আমি কি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি ?

শেক্স : কোনদিকে গেল ?

কিশোর : আজ্ঞে আমি স্বপ্ন দেখলুম, উনি ব্রীজ ছাড়িয়ে ডেপ্টফোর্ড রোড-এর দিকে গেলেন।

শেক্স : ডেপ্টফোর্ড ! মার্লো ! ডেপ্টফোর্ড ! (দৌড়ে বেরিয়ে যায়)

কিশোর : (হাতের টাকার দিকে তাকিয়ে) স্বপ্নেরও তাহলে দাম আছে ? এ যে অনেক টাকা !

হেন্‌স্ : এই ছোকরা, আমার কথা শোন ! কখনও কোনও লোককে বিশ্বাস করবি নে, আর কোনও মেয়েলোক যদি ঠোঁট এগিয়ে দেয় তাও চুমু খাবি না। সারাদিন কাজ করবি আর রাতভোর ঘুমোবি। তাহলে দেখবি জীবনে কোনো ঝামেলা নেই। এদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। যাই রানীর কাছে, দেখি উনি কি বলেন ?

[মাথা নাড়তে নাড়তে হেন্‌সলো বেরিয়ে যেতে থাকে। কিশোর ওকে অতিক্রম করে আগেই বেরিয়ে যায়]

পর্দা

(ক্রমশ)

- পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্পর্কে শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখাটি ডাকের গোলযোগে বিলম্বে পাওয়ায় আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।
- আগামী সংখ্যায় জওহরলাল নেহরু সম্পর্কে আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে।
- অনিবার্য কারণ বশত 'গোলাপ হয়ে উঠবে'-র কিস্তি এই সংখ্যায় দেওয়া গেল না।

ভারতে শেক্সপীয়র-চর্চা

মহাকবি শেক্সপীয়রের জন্মচতুঃশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলিপুরের বেলভেডিয়ারস্থ জাতীয় গ্রন্থশালায় পুস্তক ও চিত্রের যে প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়েছিল তা অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই প্রদর্শনীটির মুখ্য বিষয়বস্তু ছিল ভারতবর্ষে শেক্সপীয়র-চর্চা-বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় শেক্সপীয়রের রচনাবলীর তরজমা-গ্রন্থ স্বভাবতই এতে প্রাধান্য লাভ করেছিল, ভারতবর্ষের শেক্সপীয়র-গবেষকদের কাছে যার মুল্য অপরিসীম।

প্রদর্শনীটি অবশ্য যতই সুপরিকল্পিত, সুষ্ঠু ও মূল্যবান হোক-তা অস্থায়ী কিন্তু এতদুপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থশালা কর্তৃপক্ষ 'শেক্সপীয়র ইন ইণ্ডিয়া' নামে যে স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন তা স্থায়িত্বের দাবি করতে পারে।

স্মারক-গ্রন্থটিতে কয়েকটি তথ্যবহুল সুলিখিত রচনা আছে, বিশেষ করে 'শেক্সপীয়র ইন ইণ্ডিয়া' রচনাটি ভারতে শেক্সপীয়র-চর্চার একটি মূল্যবান রূপরেখা। 'ইণ্ডিয়া ইন শেক্সপীয়র' রচনাটিও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এই শ্রম-সাপেক্ষ রচনাটিতে শেক্সপীয়রের নাটকে যেখানে যেখানে ভারতবর্ষের উল্লেখ আছে তা বিশেষ যত্ন সহকারে উৎকলিত হয়েছে। রসিকজনের কাছে যাই হোক, গবেষকদের কাছে এই ধরনের রচনার মূল্য তর্কাতীত। কিন্তু স্মারক গ্রন্থটির অমূল্য সম্পদ পরিশিষ্টে সংযোজিত ভারতে শেক্সপীয়র-চর্চার পুস্তকপঞ্জীটি।

সংবিধানে তালিকাভুক্ত তেরটি ভারতীয় ভাষায় শেক্সপীয়রের রচনাবলীর যে সব তরজমা, কাহিনী-সার বা আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এই পুস্তকপঞ্জীতে তা সমগ্রভাবে তালিকাভুক্ত করার প্রয়াস করা হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থশালার মত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ ব্যতিরেকে এই কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব ছিল না বলাই বাহুল্য।

তালিকাটি অবশ্য সম্পূর্ণ নয়, সংকলকরাই লিখেছেন : It will be seen from the bibliography that many incomplete entries have been included. We have not seen the books relating to these entries. We have, however, thought it fit to offer to our readers whatever particulars we could collect about them. At least

this will help these who feel interested to make further search for details.

অন্যান্য ভাষার কথা জানা নেই, বাংলা ভাষার তালিকার দু-একটি অসম্পূর্ণতার দৃষ্টান্ত এমন কি বর্তমান লেখকের মতো অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও চোখে পড়েছে।

তবে এ-সব অসম্পূর্ণতা তুচ্ছ এবং বাংলা দেশের শেক্সপীয়র অনুরাগীদের সহযোগিতায় সহজেই তা পূরণ করা সম্ভব।

এই পুস্তকপঞ্জী দৃষ্টে দেখা যায় ভারতবর্ষে শেক্সপীয়র-চর্চা প্রধানত মহাকবির নাটকের তরজমাতেই সীমাবদ্ধ। আর এদিক দিয়ে বাংলাদেশই সবার চেয়ে এগিয়ে আছে।

এই পুস্তকপঞ্জীতে মোট ৬৭০টি গ্রন্থ তালিকাভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫, বাংলা ভাষায় ১২৮, গুজরাতি ৩৪, হিন্দী ৭০, কানাড়ি ৬৬, মলয়ালী ৪০, মারাঠী ৯৭, ওড়িয়া ৭, পাঞ্জাবী ১০, সংস্কৃত ৭, তামিল ৮৩, তেলেগু ৬২ ও উর্দু ৪৮।

কিন্তু তরজমার কাজ কিছুটা অগ্রসর হলেও, ভারতীয় ভাষায় শেক্সপীয়র আলোচনা এখনও খুবই পিছিয়ে আছে। বাংলা ভাষাতেই শেক্সপীয়র সংক্রান্ত গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র তিনটি। তিনটিই জীবনীগ্রন্থ। তার মধ্যে দুটি একই ব্যক্তির লেখা এবং দুটি কিশোর-পুস্তক। অন্যান্য ভারতীয় গ্রন্থ-তালিকার দিকে তাকালেও একই ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। অবশ্য ভারতীয়দের রচিত ইংরেজী ভাষায় শেক্সপীয়র সংক্রান্ত ৫০টি গ্রন্থ পুস্তকপঞ্জীতে তালিকাভুক্ত হয়েছে কিন্তু তার অধিকাংশই কলেজ-পাঠ্য পুস্তক।

অবশ্য অন্তত বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে অনেকেই শেক্সপীয়রের সাহিত্য সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বহু প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন—কিন্তু আলোচ্য পুস্তকপঞ্জীতে তা তালিকাভুক্ত করা সম্ভব ছিল না। তবে এর প্রয়োজন আছে, কেউ এ-ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করলে তিনি বঙ্গবাসীর ধন্যবাদভাজন হবেন।

শেক্সপীয়রের এই জন্মচতুঃশতবার্ষিকী বৎসরে কোনো প্রকাশক উদ্যোগী হয়ে এই সব রচনার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করুন না কেন—তাই হবে মহাকবির উদ্দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য

—শচীন বসু

আনন্দভৈরবী। প্রমোদ মুখোপাধ্যায়। এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্‌স্‌ প্রাইভেট লিঃ। দু' টাকা।

কবি প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার আমি আগ্রহী পাঠক। এক সরল কবিত্বের সম্পদ এই কবির কবিতার জগতে ইতঃস্তত প্রকীর্ণ হয়ে আছে—তার প্রতি লোভ বরাবরই অনুভব করেছি এবং এখনো করি। সকল আধুনিক কবির মতো প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যেও একজন 'আমি' কথা বলেন কবি যাকে নির্মাণ করেছেন, রচনা করেছেন, জন্ম দিয়েছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে আনন্দভৈরবীর কবিরও কবিতা রচনা প্রকৃতপক্ষে এই আমিকে মূর্ত করে তোলা। প্রথম কবিতা 'স্বগত ভাষণে'ই বোঝা যায়, অনুভব করা যায় আলোচ্য কবির অপ্রতিরোধ্য কবিত্বকে। তিনি জানেন যে কবিকর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা আর কবিত্ব একার্থক নয়। আমরা আনন্দ-ভৈরবীর অনেকগুলি কবিতা সম্বন্ধেই একথা বলতেও পারি যে কাব্যিক প্রসঙ্গের জন্য ভাবনাতুরতার জন্যই সেগুলিকে আমরা বাহবা দিচ্ছি না—কবির আত্ম-ঘোষণা না হয়ে কবির আত্মার অভিজ্ঞানের বাহক হতে পেরেছে বলেই তারা কাব্য হয়েছে। প্রসঙ্গত 'স্বগত ভাষণ'-এর দ্বিতীয় স্তবকের সবটাই উদ্ধৃত করা যেত, যদি না স্থানাভাব প্রতিবন্ধক হত।

কোনো কবি সভ্যতা এবং চলিষ্ণু সময়ের জটিল গতি সম্বন্ধে সচেতন একথার চেয়ে, বস্তুতঃ এই কথাটি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ যে সময়ের প্রতিঘাতে অনেক ভেঙেগড়ে কবি এক বৃহত্তর 'আমি'কে গড়ে তোলেন। সেই 'আমি' তখন তাঁর সময়ের রূপককে ধারণ করে। আনন্দভৈরবীর 'আমি'ও নিঃসন্দেহে সেই প্রয়াসে বিশিষ্ট হতে চেয়েছে। এর জগতে সমকালীনতা ছায়া ফেলেছে—সেই কালের এক প্রান্ত রয়েছে অতীতে, অন্য প্রান্ত ইঙ্গিত দিচ্ছে ভবিষ্য নির্মাণের। কোণার্কের মিথুন মূর্তি, লোককাব্যের অবিনশ্বর ভাবরূপক যেমন কবিতাগুলির প্রসঙ্গ, তেমনি সেই প্রসঙ্গগুলির সাহায্যেই কবি রচনা করেছেন স্ব-ভাষা। সেটা তাঁর অভিজ্ঞতার ভাষা হয়েছে। 'অন্ধকার ঢেউ ভাঙ্গে', 'কোণার্ক মিথুন', 'কেন্দুবিল্বের মেলায়' প্রমুখ কবিতাগুলিতে আনন্দভৈরবীর আনন্দলোকের বিমলবিভা। 'ল্যাণ্ডস্কেপ', 'সাঁওতাল প্রেমিক ওরা', কবিতাগুলিতে নিসর্গমুক্তির মাঝে তিনি এক সুস্থ মানবিক স্বর এনেছেন। 'জাতিস্মর'-এর মতো কবিতায় কবির হৃদয়প্রতিমায় হৃদয়েরই রঙ লেগেছে, অথচ

সময়ের রঙ একেবারে মুছে যায় নি। আর যা নেই এই কবিতাগুলিতে তা হল বিবর্ণ বিষণ্ণতা। আনন্দভৈরবীর নামকরণ থেকে শুরু করে কোথাও সুখের কথাই হোক বা দুঃখের কথাই হোক—গ্লানির গরিমা প্রবল হতে চেষ্টা করেনি। নিচের স্বীকারোক্তি তাই নিঃসন্দেহেই কাব্যোক্তি—এর মধ্যে তাঁর শক্তি এবং দুর্বলতা দুয়েরই ইঙ্গিত উপস্থিত।

এই ভালবাসা যেন অঙ্গে অঙ্গে প্রতি রোমকূপে
ফোটার রোমাঞ্চ আনে, আমি যেন মঞ্জরিত তরু
কিম্বা তার একতারা, যে আমার কেড়ে নেয় সবই
নিষ্ঠুর দরদে শুধু আমার বুকের তারে তারে
সে জন বাজিয়ে যায় মনমাতানো আনন্দভৈরবী।

একতারা এবং আনন্দ ভৈরবী কতখানি মেলে জানি না কিন্তু বাউলের মতোই এই কবি আপনাতে আপনি বিভোর। এইটাই সৎ কবিতা রচনার একমাত্র পন্থা, এবং বাকি সব পথই ভুল এমন কথা বলার স্পর্ধা যেন না থাকে, তবে প্রমোদবাবুর এই চারিত্র তাঁর স্বধর্ম। একে রক্ষা করা, লালন করা এবং অধিকতর সংগঠিত করা তাঁর সারাজীবনের কবিকর্তব্য।

তাই আনন্দভৈরবীর পরেও তিনি আরো কবিতার বই লিখবেন বলে কতকগুলি কথা নিবেদন করা সমীচীন মনে করি। দুদিকে তাঁকে সতর্ক হতে হবে। তাঁকে প্রথম সতর্কতা গড়ে তুলতে হবে চিত্রকল্প-প্রয়োগের ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে তাঁর ত্রুটি যা পরে বৃহৎ হতে পারে তার দুটি মুখ। প্রথমত চিত্রকল্প নির্মাণে আলস্য। 'স্বগত ভাষণ'-এর প্রথম স্তবকে কয়েক চরণের মধ্যে "যেন তার ঘামার মতন" "স্রোতের দিয়ার মত" এবং "আরোগ্যের মত এক গভীর আরামে"—এই চিত্রকল্প এবং ভাবচিত্র দুটি বারবার 'মত' শব্দের প্রয়োগে নষ্ট হয়েছে। সহজেই একটু পরিমার্জিত করা যেতে পারত। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে তাঁর গভীরতর ত্রুটি চিত্রকল্পের বা সঙ্গীতকল্পের অসংলগ্ন প্রয়োগ। 'সাঁওতাল প্রেমিক ওরা' কবিতায় শেষ স্তবকে কিছুতেই আর সাঁওতাল প্রেমিক-প্রেমিকাকে পাওয়া যায় না। আধারটুকু কবি নিজেই ভেঙে ফেলেছেন সেতারের উপমা-প্রসঙ্গ এনে। এমনি করেই ভূমিকা-কবিতায় একতারা ও ভৈরবীর সংযোগে প্রত্যয় হয়েছে বিঘ্নিত। এই সূত্রেই আরেকটি কথা বলার থাকে। অগ্রজ কবির বাণীসন্নিবেশ-সৌন্দর্যের উত্তরাধিকার সরল ভাবেই কখনো কখনো তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলেছে। উত্তরাধিকারে আপত্তি নেই।

উত্তরাধিকার কবিত্বের সংজ্ঞা নিরূপণে কর্তব্য-নির্দেশনায় সহায় হোক। কিন্তু কাব্যের আকৃতিপ্রকৃতি নির্মাণে কবির স্বাধীন তপস্যাই কাম্য। প্রমোদবাবু সে সাধনার ক্ষেত্রেই অধিষ্ঠিত আছেন—শুধু কখনো কোথাও আলস্যকে প্রশ্রয় দিয়েছেন বলেই এ-কথাটা বললাম।

আর এক বিষয়ে তাঁকে অবহিত হতে হবে। সংস্কৃতির আনন্দলোকে তাঁর যেমন সহজ আনাগোনা, প্রত্যহের জলকাদায় যেন তাঁর ইচ্ছা ততটা জাগ্রত নয়। গৌরব বহনে তিনি অতন্দ্র। কিন্তু গ্লানি-স্নান না হলে তিনি পূর্ণ হবেন কী করে। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আমাদের সকলেরই শিক্ষা। দুঃখের তিমিরকে তিমির বলে জেনেই তো মঙ্গলালোকের কল্পনা, বিশুষ্ক জীবনের পটেই তো করুণাধারার প্রত্যাশা। আনন্দভৈরবীর কবিকে সেই জলকাদা, গ্লানি, গঞ্জনার পথ কিছু মাড়াতে হবে। তাহলে তাঁর কাব্যিক ভাষার লালিত্যটুকু কিছু হারাবে, কিছু স্নিগ্ধতা ঝরে যাবে। কিন্তু তার বদলে যা আসবে তা চলিষ্ণু স্বাস্থ্য।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েকটি কণ্ঠস্বর। মণিভূষণ ভট্টাচার্য। কবিপত্র প্রকাশভবন। আড়াই টাকা।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য-এর 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' তরুণ কবিদের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তারুণ্যের ঝোঁকে কবিতায় উচ্ছৃঙ্খলতাকে মৌলিকত্ব ভাবার দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক কবিদের কাব্যে প্রকট এবং এ-ব্যাপারটা নানা কৌতুকের দৃশ্যের অবতারণা ইতিমধ্যেই করেছে। অবশ্য এর অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, তরুণ কবিদের হাতে বাংলা কবিতা রসাতলে যাচ্ছে। এর তাৎপর্য এইখানে, সাম্প্রতিক কবিবৃন্দ বর্তমান সমাজেরই প্রত্যক্ষ শীকার, সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার দৃষ্টান্ত হয়ে পড়েছেন, সময়ের মুঠি ছাড়িয়ে সময়কে আনতে পারছেন না।

আমার বক্তব্য, অবশ্যই এই নয়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য এটা পেরেছেন। হয়তো প্রথম কাব্যগ্রন্থে এটা সম্ভব নয়, তবু কয়েকটি আশাপ্রদ লক্ষণ আলোচ্য কবির কবিতাসংকলনে দ্রষ্টব্য।

কবি মণিভূষণ, ভাষার দিক থেকে কাব্যিক কৃত্রিমতায় বিশ্বাসী নন। অর্থাৎ যতটা সম্ভব তাঁর পক্ষে, ততটা তিনি মৌখিক ভাষা, আরও ঠিকভাবে

ক্রিয়াকে কবিতায় বলবৎ রেখেছেন। ইদানীং বাংলা কবিতার মূল ঝোঁকের বিপক্ষেই সাধু ক্রিয়া, তথাকথিত কাব্যিক শব্দাবলী (মোর, তরে ইত্যাদি) প্রভৃতি ব্যবহারের প্রবণতা কবিদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল—অনেক ক্ষেত্রে ছন্দ বাঁচাবার জন্য এর ব্যবহার ঘটেছে, যার অন্য অর্থ কবিদের পরিশ্রমবিমুখতা। সুখের বিষয়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য-এর কবিতায় এই কৃত্রিমতা তথা পরিশ্রমবিমুখতা অনুপস্থিত দেখলাম।

শুধু তাই নয়, প্রত্যক্ষভাবে কথ্যচাল আনার প্রয়াসও তাঁর কবিতায় লক্ষণীয়। কেমন 'পোশাক' নামক কবিতার চতুর্থ স্তবক। এই কবিতা মণিভূষণের কবিস্বভাবের নাটকীয়ত্বও দেখায়। বস্তুতঃ 'উদ্ভাসিত জন্ম ও আনন্দিত মৃত্যু' কবিতাটির বিষয়বস্তু যথেষ্ট নাটকীয়। যদিও স্বয়ং কবি, হয়তো সাহসের অভাবেই এর সুযোগ গ্রহণ করেন নি। তবুও পোশাক, গল্পবিষয়ক কবিতা, অসামাজিক ইত্যাদি কবিতা মণিভূষণের ভবিষ্যৎ কাব্যনাট্য লেখার হয়তো প্রস্তুতি।

এর সঙ্গে রয়েছে, যেটা আমার কাছে খুবই প্রতিশ্রুতিময় মনে হয়েছে, ছবিতে কথা বলার চেষ্টা। উদাহরণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

১. মেঘের মন্দিরে শুধু সারারাত মন্ত্র-কথকতা।
২. নিঃশব্দে পোড়ালো তারা মৃত্যুহীন সময়ের শব।
৩. বাবার মুখের রক্ত ঘন হয় পশ্চিম আকাশে।
৪. তবু খোশগল্পে মত্ত ঢেউগুলি অপ্রস্তুত, চুপ।
৫. সূর্যের কোলে বিকেল বিপুল নদী।

কিংবা 'অন্ধকারের গল্প' নামক কবিতার শেষের দিকের একটি সুন্দর স্তবক।

ঢেউগুলি নেচে নেচে সারাদিন গল্প ব'লে যাবে
জীবন মৃত্যুতে মগ্ন কাহিনীরা পরমায়ু পাবে নিরবধি,
শতাব্দীর পুরাতন গাঢ়তম রক্তধারা স্মৃতিকে ভেজাবে,
অবিরাম ব'য়ে যাবে রূপালি কান্নায় ভরা আকাশের মতো এক নদী।

অবশ্যই মণিভূষণ ভট্টাচার্য-এর কবিতা এখনও উপযুক্ত, তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের অপেক্ষায় আছে। উক্তি ও উপলব্ধির হর-গৌরীমিলনও তাঁর ভবিষ্যৎ কবিতার ব্যাপার। আশ্চর্য গোছানো কবিতা লেখা সত্ত্বেও, আড়ষ্টতা এখনও তাঁর কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে—কোনো কোনো কবিতা তো যুক্তাক্ষরের প্রদর্শনী মনে হয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুসরণ দুরূহ—অনেক অভিনিবেশ ও

চর্চাসাপেক্ষ। বিশেষতঃ যে-সব কবিতা ধ্বনিপ্রধানে লেখা, সে-সব কবিতায় মনে হয়েছে, ছন্দ সামলাতে গিয়ে কবিতা ডুবেছে। তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে। কদাচিৎ, হলেও, অকারণে স্মার্ট হওয়ার দিকে প্রবণতা কবি মণিভূষণের আছে—কিছুটা বা শহুরে চাতুর্যে মজা। মাঝে মাঝে, অস্বচ্ছ মিল কানে লাগে। একই শব্দের বারবার ব্যবহার, ছবি আঁকায় একই তুলনার পুনঃ পুনঃ উক্তি ক্লান্তিকর ঠেকে—সেই শব্দের ব্যবহারের বিশিষ্টতাও হারিয়েছে।

তবু মণিভূষণের কাব্যগ্রন্থ আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ লেগেছে। কারণ আগেই বলেছি।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিবচন। রেবন্ত বসু। গ্রন্থজগৎ। তিন টাকা।
ভারতীয় গল্পসঙ্কলন। অনুবাদ: বোম্মানা বিশ্বনাথন। জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। চার টাকা।

যিনি 'এক প্রেমিক' কী 'মাছ'-এর মতো চমৎকার গল্প লিখতে পেরেছেন, সেই লেখককে, অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রেবন্ত বসুকে—যেহেতু সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত; অতএব সমালোচকের বকেয়া অভিনন্দনবাণীর লৌকিকতা উপহার দিতে চাই না; বরং তাঁর সম্বন্ধে স্বীকার করা ভালো যে, তিনি বেশ প্রস্তুত হয়েই আসরে নেমেছেন। এ-প্রস্তুতির পরিচয় তাঁর প্রথমতম গ্রন্থ 'দ্বিবচন'-এ বিলক্ষণ বর্তমান। সমাজ, সময়, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত উপাদান একজন মরমী কথাকারের আবশ্যিক অবলম্বন শ্রীযুক্ত বসুর মধ্যে সেগুলি যথাযথ সম্মিলিত। এবং তাঁর বাগ্‌ভঙ্গিও রীতিমতো শানানো। কোথাও তির্যক, কোথাও শ্লেষাক্ত, কোথাও বা ঋজু পরিণত কবিত্বে বিধুর। প্রাসঙ্গিক কিছু উদ্ধৃতি দেওয়ার পরিবর্তে আমি পাঠকবৃন্দকে বইখানি পড়ে নেবার জন্যে অনুরোধ করি। অবশ্যই সাধুবাদ একেবারে নিরঙ্কুশ নয়; 'সান্ত্বনা' গল্পটির শেষ অনুচ্ছেদটির ইঙ্গিতবহতা কাহিনীগত শৈথিল্যের জন্যে মাঠে মারা গেছে। এই গল্পের ভূমিকাজাতীয় কায়দা আমার কাছে শেষ পর্যন্ত মূষিকপ্রসূ পর্বতের মতো মনে হয়েছে। 'মানুষ'-এর মতো গল্প সম্বন্ধে আমার বক্তব্য: শ্রীযুক্ত বসু তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন

এখানে। এর কারণ নর-নারীর যৌনসম্বন্ধ নিয়ে কোনো রক্ষণশীল ছুৎমার্গতা নয়; ব্যাপারটা, তা মাসতুতো বোনকে জড়িয়ে হলেও, অত্যন্ত পুরনো এবং গল্প লেখার পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক। পাঁচটি গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্প দুটির নাম সর্বাগ্রেই করেছি। 'নাম' গল্পটি দ্বিধাবিভক্ত সত্তার চেহারা বর্ণনা করেছে। বেশ বড়ো গল্প, কিন্তু আদৌ ক্লান্তিকর নয়। ফ্যানটাসি ধরনের লেখাতেও রেবন্তবাবু সিদ্ধহস্ত, এই গল্পে বোঝা গেল তা।

ভারতের জাতীয় সংহতিবিধানে অন্যতম প্রয়োজন মনে হয় প্রাদেশিক ঐতিহ্যের কূপমণ্ডুকমনোবৃত্তি দূর করা। ভাষাগত অহম্‌বোধও এই ঐতিহ্য-বিলাসের অন্তর্গত। সুতরাং প্রাদেশিক ভাষাগুলির সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত বোম্মানা বিশ্বনাথন বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য এই কাজ অনেকদিন থেকেই করে আসছেন এবং এ-ব্যাপারে সাধুবাদও পেয়েছেন বিস্তর। তাঁর সম্পাদিত 'ভারতীয় গল্পসঙ্কলন'-এর অন্তর্ভুক্ত চৌদ্দটি গল্পের অনুবাদক, বলা বাহুল্য, তিনি নিজেই। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল; যদিচ, এবং এখানেই বিস্ময়, অনুবাদক অবাঙালী। প্রত্যেক ভাষার জন্যে মাত্র একটি করে গল্প শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথন অনুবাদ করেছেন। সুতরাং তা থেকে সেই ভাষার চরিত্র ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা অবশ্য করা সম্ভব নয়; এবং গল্পগুলিও অত্যন্ত ছোট। তবু সেগুলি থেকে একটা উদ্দেশ্য অন্তত সার্থক হয়েছে। প্রতিটি প্রদেশের সাহিত্যকৃতি মানুষের একটা ভাষানির্বিশেষ সাধারণ স্বরূপকে বিম্বিত করেছে। ভালোবাসার ও ভালোবাসবার আকাঙ্ক্ষা, দারিদ্র্য, ঘরোয়া জীবনের খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত এই গল্পগুলিকে আমাদের অত্যন্ত নিকটের করে তুলেছে। প্রতি ভাষার গল্পের সঙ্গে সেই ভাষা সম্বন্ধে ঈষৎ পরিচিতি আছে। এই পরিচিতি আমাদের, বঙ্গভাষাভাষীদের কাছে, দরকারী সন্দেহ নেই।

শিবশম্ভু পাল

সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'

কোনো একজন চলচ্চিত্ররসিকের এক প্রশ্নের জবাবে কিছুকাল আগে সত্যজিৎ রায় জানিয়েছিলেন 'নষ্টনীড়'-এর মধ্যে তিনি ঘরে-বাইরেকে একত্র করবেন—এ-ছবি শুধুমাত্র তিনটি বা চারটি ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ট্র্যাজেডি হবে না—এ ছবির মধ্যে একটি বিশেষ কালকে ধরবার চেষ্টা করা হবে। এখন স্বীকার করতে বাধা নেই যে এই উক্তি তখন মনের মধ্যে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করেছিল—মনে হয়েছিল 'মহানগর'-এ যে দেশকাল ও ব্যক্তির সামগ্রিক রূপ প্রত্যাশিত ছিল—'নষ্টনীড়'-এর নিছক অন্দরমহল-অবলম্বী ব্যক্তিক-সম্পর্ক-আশ্রয়ী কাহিনীতে তা আনবার দরকার কি—আনা যাবেই বা কি করে (এ-ভাবনা অবশ্য শুধু শিল্পীরই হবার কথা—তবুও অনধিকার চর্চা থেকে সব সময়ে উদ্ধার পাওয়া যায় না)—আর আনলে 'নষ্টনীড়'-এর যে ঘনসংবদ্ধ শিল্পরূপটি আছে সেটি খণ্ডিত হবে কিনা।

তারপর ছবিটি দেখা হল। প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে আবার একটা পরিচিত সত্যই প্রতিষ্ঠিত হল যে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে "ফলেন পরিচীয়তে"—এই শেষকথা। কোনো পূর্বকল্পিত ধারণা নিয়ে যে কোনো শিল্পকর্মের সম্মুখীন হতে নেই—একথা বেশ স্পষ্ট ভাবেই প্রতীয়মান হল।

একথা সত্যি যে নিছক ব্যক্তিগত সম্পর্কের সংঘাতকে যে কোনো দেশকালেই বিধৃত করে দেশকালকে শুধুমাত্র পটভূমিকা রেখে শিল্পসৃষ্টি করা যায়—যদি সেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে চিরন্তনতার আভাস থাকে। কিন্তু 'চারুলতা'-তে সত্যজিৎ রায়-এর অন্বিষ্টই অন্যরকমের। বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালকে শুধুমাত্র একটা সম্ভাব্য বিশ্বাসযোগ্য পটভূমিকা করেই রাখা নয়—তাকে social এবং ideological force হিসাবে ছবিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে দৃশ্যমান করাই ছিল তাঁর অভিপ্রেত এবং ব্যক্তিগত সমস্যাকে সেই দেশকালীন সমস্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত করে রূপায়িত করা তাঁর শিল্পগত উদ্দেশ্য ছিল।

সে উদ্দেশ্য যে কি অসাধারণভাবে সাধিত হয়েছে তা আক্ষরিক অর্থে কল্পনার অতীত ছিল। দেশকালকে এ ছবিতে শরীর ও আত্মাসহ দৃশ্যমান

করা হয়েছে এক অনুকম্পায়ী মন নিয়ে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। শরীরের দিকটাতে অবশ্য নতুন করে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই—কেননা 'milieu' তৈরি করবার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত সত্যজিৎ রায়-এর অসামান্য শিল্পজ্ঞানের পরিচয় আমরা প্রথম থেকেই পেয়ে আসছি (এ-ব্যাপারে তার সহকর্মী শিল্পনির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্তের কথা উল্লেখ করতে হয়)। 'পথের পাঁচালি'র ইন্দির ঠাকুরণের ছেঁড়া কাঁথা থেকে শুরু করে—'অপরাজিত'তে ঘটিতে হাতার হাতল সহযোগে চা তৈরি, 'অপুর সংসার'-এ অপুর ঘর, 'দেবী' বা 'জলসাঘর'-এর অপসৃত ও অপস্রিয়মান জগৎ, 'অভিযান'-এ সুখনরামের ঘরের দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের ছবি, 'মহানগরে' তোবড়ানো থালাতে মাছের মুড়ো সবকিছুই নিখুঁত বস্তুচেতনার পরিচায়ক এবং সেখানে আবার বস্তু এক নিবিড় মমত্ববোধে সঞ্জীবিত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে 'চারুলতা'র details-এর কাজগুলি অসামান্য হওয়া সত্ত্বেও বিস্ময়কর নয়—কেননা এ শিল্পগুণের অস্তিত্ব সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে এখন স্বতঃসিদ্ধপ্রায়। তাই 'চারুলতা'তে আসবাবপত্র, সাজসজ্জা, নক্সাকাটা মাদুর, পানের বাটা, খাতার ওপরে চিত্র, দেওয়ালের ছবি, দোয়াতকলম ইত্যাদির মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধকে যেভাবে শরীরী রূপ দেওয়া হয়েছে তাকে গ্রহণ করতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম। শব্দযোজনা প্রসঙ্গেও এই কথা খাটে। 'পথের পাঁচালি'তে সর্বজয়া-ইন্দির ঠাকুরণের কলহের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেশীর বাড়িতে ভিক্ষুকের কণ্ঠের দেহতত্ত্ব সঙ্গীতের অর্ধস্পষ্ট সুর থেকে কিংবা গভীর রাত্রের ঝিঁঝির ডাক আর দূরাগত ট্রেনের আওয়াজে পাঠরত শিশু অপুর অন্যমনস্ক হওয়া, ঐ ট্রেনের আওয়াজ শুনেই সর্বজয়ার মুখে সংসারযন্ত্রণার তিক্ততা ফুটে ওঠার দৃশ্য থেকেই আমরা সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে শব্দযোজনায় সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় পেয়ে আসছি। 'পরশপাথর'-এ প্রতিবেশীর গৃহের 'সরগম' অভ্যাসের আওয়াজ, 'জলসাঘরে' সুরবাহারের সুরকে ছাপিয়ে Electric generator-এর থটথট একটানা শব্দ, 'মনিহারা'তে গভীর রাত্রে দূরের যাত্রার আসরের ভেসে-আসা সুর, মহানগর-এ রেডিওর আওয়াজ, ফেরিওয়ালার ডাক—তালিকাবৃদ্ধি করা কঠিন নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'চারুলতা'তে ফেরিওয়ালার ডাক, বাগানে ঘুঘুর ডাক, ঝড়ের সময় কাঁচ-ভাঙ্গার শব্দ, ট্রামের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ঐ পরিচিত বস্তুচেতনারই দান। অন্যান্য ছবির মতো 'চারুলতা'তেও ঐ সব শব্দের একটা স্বতন্ত্র

subjective value অবশ্য আছে—নিঃশব্দ গৃহপিঞ্জরবদ্ধ চারুর কাছে ঐ সব শব্দ বাইরের জগতের দুর্লভ স্বাদ এনে দেয়—কিন্তু সে প্রসঙ্গকে বাদ দিলেও—দৃশ্যেশ্রাব্যে ছবির জগতকে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলবার যে ক্ষমতার পরিচয় আমরা 'পথের পাঁচালি' থেকেই পেয়ে আসছি—'চারুলতা' সে ক্ষমতারই একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এবং এক্ষেত্রে এই ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পুষ্ট করেন নি—করেছে সযত্ন অধ্যয়ন আর কল্পনাশক্তি—তাই বোধহয় এক্ষেত্রে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ অতিরিক্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে।

কিন্তু যে দিকটা সত্যিই আমার কাছে অকল্পনীয় ছিল, সেটা উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চবিত্তের গৃহের যথাযথ রূপায়ণ নয়—সেটা হল উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা-আন্দোলনকে এমন অদ্ভুত ভাবে এ ছবির সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে অন্বিত করে তোলা। এই অন্বয় সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব সৃষ্টি এবং এর মধ্যে তার পূর্বপ্রতিশ্রুতি চরম সার্থকতার সঙ্গে পালন করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা-আন্দোলনকে কেউ বা renaissance বলেন, কেউ বা ওর অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রস্তুত না হবার দায়ভাগে এবং জনজীবনের গভীরে প্রবেশে অসমর্থ হবার দায়ভাগে ওকে renaissance বলে মানেন না—কেউ বা তাকে বলেন অসম্পূর্ণ renaissance. সে ঐতিহাসিক তর্ক এখানে অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু এটা না মেনে উপায় নেই যে পাশ্চাত্ত্য-চিন্তার ঢেউ আমাদের তৎকালীন চিন্তাশীলদের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সে আলোড়নের ফলশ্রুতিতে অন্তত একটা মূল্যবান জিনিস নিশ্চয় আমরা লাভ করেছিলাম—জাতীয় চেতনা—যার একদিকের প্রকাশ হিসাবে আমরা আমাদের সমৃদ্ধ বাংলা-সাহিত্যকে পেয়েছি। যত সীমিতভাবেই হোক সেই আন্দোলনের ঢেউ অন্দরমহলেও পৌছেছে এবং রান্নাঘরের গণ্ডী থেকে মেয়েদেরও বাইরে বার হবার বাসনাকে অন্তত জাগিয়ে তুলেছে। সামন্ততন্ত্রকে অর্থনৈতিক ভাবে ইউরোপের রেনাঁসাসের মতো আমাদের রেনাঁসাস কি পরিমাণে আঘাত করতে পেরেছে—তা অন্যত্র বিবেচ্য—কিন্তু সামন্তশ্রেণীর অনেক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিকে যে কর্মে প্রবৃত্ত করে "idle rich" অপবাদ খণ্ডন করতে প্রণোদিত করেছে—তার খবর শুধুমাত্র ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস থেকেই স্পষ্ট। এখন একে আমরা ধার-করা renaissance বলি আর imperfect renaissance বলি না কেন—এর impact-গুলিকে অন্ধের মতো অস্বীকার করা সম্ভব

নয়। সত্যজিৎ রায় সেই impact-কে 'চারুলতা'তে স্বচ্ছবুদ্ধি এবং অপরিসীম দরদের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন ছবির পটভূমিকা হিসাবে নয়—ছবির অন্তর্নিহিত চরিত্র হিসাবে। তিনটি প্রধান চরিত্রই ঐ ভাবগত আন্দোলনের মধ্য থেকে প্রাণ সংগ্রহ করেছে। ভূপতিকে সত্যজিৎ রায় লিবারাল পেট্রিয়টদের প্রতিভূ করেছেন—রাজনীতি তার নেশা বা পেশা নয়—তার প্রাণের অঙ্গ। দেশপ্রেম, সাধুতা, মানুষে ও নিজের ওপরে অগাধ বিশ্বাস তার জীবনের ভিত্তি—সেই ভিত্তি ঘরে-বাইরে যখন সরে গেল তখন তার সামনে সবকিছু স্তব্ধ—সবশূন্য। অমল প্রারম্ভে চপল, উচ্ছল, অসংযত রোমান্টিক, কিছুটা ভীতু (চারুকে দোল দেবার আগে চারপাশ দেখে নেয়)—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার maturity আসতে থাকে—দায়িত্ববোধ জন্মায়। চারুলতা প্রকাণ্ড এক বাড়িতে নিঃসঙ্গ একা, বাইরের জগতের আভাস পেয়েছে—পরিপূর্ণ স্বাদ পায় নি, স্বাদ গ্রহণের জন্য প্রাণপণে সাহিত্যকে আঁকড়ে ধরেছে—'বঙ্কিম' তার কাছে তার চার-দেওয়ালের বাইরের আকাশ। অপেরা গ্লাস দিয়ে সে বাইরের বস্তুজগতকে সন্নিকট করতে চায়। আর তার সম্বল আত্মগত চিন্তা (আঃ মানুষ ভাবেও তো বাপু)।

প্রত্যেকটি চরিত্রকে কালধর্মে পরিপুষ্ট করার ফলে ছবিটির যে একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতি তৈরি হয়েছে তা সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব সৃষ্টি। এই স্বাতন্ত্র্য ভূপতির চরিত্রেই সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মূল গল্পের ভূপতি সাদামাটা মানুষ—গল্পলেখক তার "সম্পাদকী নেশা আর রাজনৈতিক নেশা"কে সস্নেহে ঠাট্টা করেন—সত্যজিৎ রায়ের ভূপতির রাজনৈতিক চেতনা আর সাংবাদিকতা ("There is nothing like the sound of a printing press") তার আদর্শনিষ্ঠারই একটা দিক—সেখানে হাসিঠাট্টার কিছু নেই (Sentinal-কে চারুলতার 'সতীন' বললেও নেই)—তাই "মৃত সৈনিকের" দৃশ্য অমন গভীর ট্র্যাজিক গুণ অর্জন করেছে। "Unflinching regard for truth" আর "integrity" নিয়ে ভূপতি উনবিংশ শতাব্দীর বলিষ্ঠ পুরুষচরিত্র হিসাবে বরঞ্চ গোরার ও নিখিলেশের সমগোত্রীয়। শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সযত্ন অভিনয় বিশ্বাসভঙ্গজনিত ট্র্যাজেডির রূপায়ণে সত্যজিৎ রায়কে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

অমলের চরিত্রের মূল দিকগুলি সত্যজিৎ রায় অক্ষুণ্ণ রেখেছেন—তবে

একজন বাস্তবতাবাদী দৃঢ়তাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিতুলনায় একজন অসংযত রোমান্টিক কল্পনাবিলাসী কোমলস্বভাব যুবকের উপস্থাপনায়—দ্বিবিধ ভাবধারার পারস্পরিক সংঘাতকে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারটা সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়নৈপুণ্যে অমল প্রাণবন্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মূল গল্প থেকে বিচ্যুতির ব্যাপারে যে সব সাধারণ অভিযোগ শোনা যায় তার আলোচনা এখানে অবান্তর কিন্তু একটি বিষয়ে ঐ অভিযোগ একটি বিশিষ্ট চেহারা নিয়েছে—এবং সে অভিযোগের মধ্যে আমাদের নিজেদের ঊনিশশতকী রক্ষণশীল মনোবৃত্তি উঁকি দিচ্ছে। চারুলতার প্রেমের অসংযত আত্মপ্রকাশে অনেকে ভীষণ রকমের মর্মাহত হয়েছেন এবং "পবিত্র" রবীন্দ্র-সাহিত্যের অবমাননা করার জন্য অনেক "রবীন্দ্রভক্ত" সত্যজিৎ রায়কে ধিক্কার দিচ্ছেন। প্রথম কথা হল এই যে চারুর অবদমিত আকাঙ্ক্ষার আত্মপ্রকাশ দেখাতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'নষ্টনীড়' গল্পে কোথাও কার্পণ্য করেন নি—সত্যজিৎ রায় চারুলতার চরিত্রের "প্যাশন" রবীন্দ্রনাথের মূল গল্প থেকেই নিয়েছেন। হয়তো ছবিতে প্রকাশটা কিছুটা বেশি প্রকট হয়েছে—ছবির আবেদন অনেক প্রত্যক্ষ—কিন্তু তাতে দুটো উপকার হয়েছে। এক হল এই যে রবীন্দ্রনাথ যে শুধু ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতা নন—তিনি যে 'ল্যাবরেটরি'র মতো গল্প 'চতুরঙ্গ'-এর মতো উপন্যাস রচনা করেছেন—"ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া নাই ভয় নাই লজ্জা" এ কথা যে তাঁরই রচনা—সেই রবীন্দ্রনাথকে এ ছবিতে পাওয়া গেছে (যদিও এ কথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণের সামনে উপস্থিত করাই সত্যজিৎ রায়ের উদ্দেশ্য নয়—তবুও সে উদ্দেশ্য এতে সাধিত হয়েছে), আর দ্বিতীয়ত চারুর "ক্ষুধার্ত প্রেম"কে অনমনীয়ভাবে রূপায়িত করায় এ ছবির সর্বাঙ্গে এমন একটি চাপা violence ফুটে উঠেছে যার তুলনা খুব কম ছবিতেই মেলে—এই violence শরীরী নয়—চাপা হবার ফলেই এর ভেতরকার হাহাকার আর যন্ত্রণা এত ভয়ঙ্করভাবে ফুটেছে। চারুলতাকে বিশেষকালে আবদ্ধ রেখেও সত্যজিৎ তার মধ্যে মানুষের চিরন্তন elemental দিকগুলিকে রূপ দিয়েছেন—প্রখর আত্মাভিমান আর পিপাসার্ত দেহমন নিয়ে এক নারী সর্বব্যাপী নিঃসঙ্গতার মধ্যে শূন্যচারী গ্রহের মতো ঘুরছে—এ ছবিতে সেদিক থেকে "a study in lonliness of a woman" বলা যায়। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে সত্যজিৎ রায় সেই নিঃসঙ্গতার, অতৃপ্ত কামনার, আহত

অভিমানের ভয়ঙ্কর ছবি এঁকেছেন-–তার মধ্যে মোলায়েম করবার কোনো চেষ্টা নেই বরঞ্চ 'পাকাচুল তোলা'র দৃশ্যে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেয়েছে। চারুর মুখ যেন বেলা বালাজ কথিত "Der Sichtdare Mann"-এর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সেই মুখে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা দেখানো হয়েছে—দোলনায় দুলতে দুলতে "ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে" গান গাইবার সময় আনন্দোজ্জ্বলে মুখ—হঠাৎ ভাবনায় গম্ভীর হয়ে উঠেছে, বিশ্ববন্ধুর লেখা নিয়ে অমলকে আঘাত করবার সময় সে মুখে বেদনার তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে, অমলের অতর্কিত অন্তর্ধানের পর গাছে জল দিতে দিতে সে মুখে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা ফুটেছে, শেষ দৃশ্যের স্থির চিত্রের 'Close up'এ সে মুখে ভয় ও যন্ত্রণার এক শ্বাসরোধকারী অভিব্যক্তি ফুটেছে। চারুর নিঃসঙ্গতার ট্র্যাজেডী আর ভূপতির বিশ্বাসভঙ্গজনিত ট্রাজেডী একত্রে গ্রথিত করে শেষ পর্যন্ত সত্যজিৎ রায় এই দুটি চরিত্রকে চিরস্থায়ী নিঃসঙ্গতার অন্তহীন আকাশে দুই দূরবর্তী গ্রহের মতো বদ্ধ রেখে ছবি শেষ করেছেন—যেখানে কালের গতি স্তব্ধ—অতীত বর্তমানের বোঝা, আর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে অবলুপ্ত।

এ ছবিকে এককথায় "সুন্দর" বলা অর্থহীন কেননা এ ছবি বিশেষ অর্থে "নির্মম"। নির্মাণপদ্ধতির অসামান্য aesthetic beautyর দিকে তাকিয়ে ঐ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়তো যায়—কিন্তু এ ছবির নির্মাণপদ্ধতি এ ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। zoom পদ্ধতিতে নৈকট্য-দূরত্বের রূপায়ণ এবং গতির সাঙ্গীতিক উত্থানপতন রচনা, subjective cameraর ব্যবহার (দোলনায় চারুর দৃষ্টিকোণ থেকে অমল, গীতরত অমলের দৃষ্টিকোণ থেকে বসে-থাকা চারু) focus-এর হেরফের করে নিঃশব্দে চারু-অমলের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপায়ণ ; অন্ধকারের ব্যবহার আর শেষে স্থিরচিত্রে ট্রাজেডীর ভয়াবহতার রূপায়ণ চরম শিল্পোৎকর্ষের পরিচয়। "চারুর জীবনে অমল ঝড়ের মতো আসিয়া পড়িল" এ ব্যাপারটা পড়লে বা শুনলে মনে হতে পারে literary image-এর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু ছবির মধ্যে সেটি পরিপূর্ণ দৃশ্যধর্মে ভাষায় আক্ষরিক অর্থে অবর্ণনীয়ভাবে রূপায়িত করা হয়েছে—তা ছাড়া মূলত এই ঝড়ের image-টি সাহিত্যে পূর্বে ব্যবহৃত হলেও—এটা দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই সংগ্রহ করা—যেখানে চলচ্চিত্র-শিল্পের অবাধ অধিকার।

কিন্তু এ-ছবির নির্মম ট্রাজেডীর সঙ্গে সত্যজিৎ রায় সাধারণ অনুকম্পায়ী

মনোবৃত্তির কোনো অসামঞ্জস্য নেই। সামগ্রিকভাবে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্মে অতীতের প্রতি নিবিড় মমত্ববোধ (nostalgia—ভালো অর্থে) আর ভবিষ্যতে অগ্রসর মন একত্রে কাজ করে—সম্ভবত সব মহৎ শিল্পকর্মেই এই দুই আপাত-বিরোধী মনোবৃত্তির দ্বৈতরূপ কাজ করে। অপস্রিয়মান জগতের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ; সত্যজিৎ রায়—রবীন্দ্রনাথ বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। 'অপরাজিত' উপন্যাসের উপসংহারে নিশ্চিন্দিপুরে ভাঙা রান্নাঘরে সর্বজয়ার ভাঙা কড়াই অপুর মনে যে অবর্ণনীয় অনুভূতির সঞ্চার করে—সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্মে সে অনুভূতির স্পর্শ আছে। ঐ গভীর মমত্ববোধে 'পথের পাঁচালী' সিঞ্চিত। অপস্রিয়মান জগতের প্রতি মমত্ববোধ আর ভবিষ্যতের প্রতি অগ্রসর মনের নির্মম উদাসীনতার দ্বৈতরূপ 'অপরাজিত' ছবিতে পাওয়া যায়। 'জলসাঘর' ও 'দেবী'ও ঐ মমত্ববোধের পরিচয় বহন করছে। অপুর মমত্ববোধ অমলের উক্তিতে সমর্থন পায় : "হায়রে মানুষের মনই শুধু পশ্চাতের দিকে ধায়, জগৎসংসার সেদিকে ফিরিয়াও তাকায় না।" উনবিংশ শতাব্দীর প্রতি সত্যজিতের এই মমত্ববোধের স্পর্শ আমরা 'চারুলতা'তেও পাই। কিন্তু একে বলা যায় creative nostalgia—কেননা এতে মানুষকে "রক্ষণশীল" করে না বরঞ্চ তার জীবনাদর্শকে মানবিক করে তোলে। এই মমত্ববোধ আধুনিকতার পরিপন্থীও নয়—কেননা অতীত কালের পটভূমিকায় মানুষের চিরন্তন সমস্যাগুলির রূপদানে আধুনিক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব—যেমন সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নাটকে কিংবা কমল মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে। 'A study in loneliness' হিসাবে 'চারুলতা' অত্যন্ত আধুনিক ছবি।

কালানুগ ও কালোত্তীর্ণের, মমতা ও নিষ্ঠুরতার, সমগ্রের ও ব্যক্তির, হাসিকান্না হীরাপান্নার, গতি ও নিশ্চলতার দ্বৈতরূপকে সন্নিবদ্ধ করে সত্যজিৎ রায় 'চারুলতা'তে একালের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের সৃষ্টি করেছেন।

ধ্রুব গুপ্ত

Adam Schaff-এর 'A Philosophy of Man' সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅশোক রুদ্র পৌষ-সংখ্যা 'পরিচয়'-এ 'humanism' সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছেন। এ বিষয়ে কয়েকটি বক্তব্য নিবেদন করতে চাই।

শাফ কর্তৃক 'প্রাচীন খ্রীষ্টীয় মানবিকতা'র উল্লেখে শ্রীরুদ্র রুষ্ট হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের মানবিকতা সম্পর্কে হীরেন মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তিকে রুদ্র বিদ্রূপ করেছেন ভাবপ্রবণ অত্যুক্তির দায়ে। শাফ ও মুখোপাধ্যায় দুজনেই 'humanism' বা 'মানবিকতা'র সংজ্ঞাকে ঘুলিয়ে ফেলেছেন এবং 'humanitarianism' বা 'জীবে দয়া'র সঙ্গে 'humanism'-কে এক করে দেখেছেন, এমন ইঙ্গিত শ্রীরুদ্র তাঁর সমালোচনায় করেছেন।

শ্রীরুদ্র নিজে 'humanism'-এর কোনো 'খাঁটি' সংজ্ঞা উপস্থিত করেন নি। কাজেই অনুমানের ভিত্তিতেই তাঁর বক্তব্যের যাচাই করতে হচ্ছে। মধ্যযুগের অন্তে ইউরোপে (প্রথমে ইতালিতে) সংস্কৃতি ও চিত্তবৃত্তির ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী পরিবর্তনের জোয়ার আসে তাই 'humanism' আন্দোলন নামে ইতিহাসে খ্যাত। 'Humanism'-এর ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্পর্কে শাফ বা শ্রীমুখোপাধ্যায় অবহিত নন বা বিস্মৃত একথা বলার ধৃষ্টতা নিশ্চয় কারও হবে না। শ্রীরুদ্রও তা বলতে চান নি, আমরা ধরে নিতে পারি। তবে প্রাচীন খ্রীষ্ট-ধর্মে ও ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে 'মানবিকতার'র সন্ধান বা উল্লেখ তাঁকে এত পীড়া দেয় কেন? সম্ভবত 'মানবিকতা' আন্দোলনের যে 'ঈশ্বরতত্ত্ব' বা 'ব্রহ্মবিদ্যা' (theology) বিরোধী একটি বৈশিষ্ট্য আছে, শ্রীরুদ্র শুধুমাত্র তার ওপর জোর দিয়েই তাঁর বক্তব্য হাজির করেছেন। তাঁর জানা আছে কিনা জানি না, 'humanism'-এর এই সংজ্ঞা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী। 'Humanism' আন্দোলনকে ঈশ্বরতত্ত্ব-বিরোধী আন্দোলনের নামান্তর বললে মধ্যযুগ ও রেনেসাঁস সম্পর্কেও অনেক ইতিহাসসিদ্ধ তথ্য বাতিল করতে হয়। একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের উক্তি স্মরণ করে বলতে ইচ্ছা করে: "The Dark Age was not as dark as it is made to look." এ কথা তো আজ অস্বীকৃত নয় যে মধ্যযুগের জ্ঞান ও চিন্তা ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা পুষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়েও সংস্কৃতির অপঘাতকে জয় করে পুনর্জাগরণের সূচনা

করতে সমর্থ হয়েছিল, সমর্থ হয়েছিল জীবনের একটা মহৎ মূল্য আবিষ্কার করতে। তুলনামূলকভাবে চৈতন্যযুগে বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলা সংস্কৃতিতে যে অভিনবত্ব সূচিত হয়েছিল তার উল্লেখ করা যায়। মধ্যযুগীয় সংস্কার চৈতন্য-প্রভাবিত সাহিত্যেরও আশ্রয়, তবু চৈতন্য-প্রভাব বাঙালীর মানস-ঐতিহ্য, বাঙালীর জীবনসাধনাকে যে বলিষ্ঠ বৈচিত্র্যের মধ্যে নবরূপায়িত করেছিল তাকে অস্বীকার করায় চপলতার মনোহারিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাসনিষ্ঠার অভাব আছে নিঃসন্দেহে।

'Humanism'-এর বৈশিষ্ট্য এক নয়, বহু। এর যে কোনো একটিকে মাত্র আশ্রয় করলে তাই পদস্খলন অনিবার্য। *Encyclopaedia of the Social Sciences*-এর প্রামাণ্য আলোচনায় Edward Cheyney ও F. S. Schiller বলেছেন, "Humanism thus means many things." চিত্তবৃত্তির স্বাধীনতা 'humanism'-এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। Encyclopaedia অনুযায়ী: "...inseparably bound up as the latter (humanism) was with emancipation of spirit and freedom of thought." প্রশ্ন করা যেতে পারে চিত্তবৃত্তির স্বনির্ভরতার মাপকাঠিতে সমগ্র প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র কি তাসের ঘরের মতো অলীক প্রতিপন্ন হবে? এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দের একটি উক্তির উল্লেখ করছি: "He (Buddha) was the first who dared to say, 'Believe not because some old manuscripts are produced, believe not because it is your national belief, because you have been made to believe it from your childhood; but reason it all out, and after you have analysed it, then if you find that it will do good to one and all, believe it, live up to it, and help others to live up to it."

এর পরও কি, বুদ্ধের বাণীতে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের মধ্যে মানবপ্রাধান্যের, চিত্তবৃত্তির পরিমুক্তির যে উপলব্ধি ছিল তাকে অস্বীকার করতে হবে, যেহেতু রেনেসাঁস যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান বা বস্তুপ্রত্যয়গত চেতনার প্রসার বৌদ্ধযুগে ঘটেনি, সেই কারণে?

দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবেও 'মানবিকতা'-বাদকে একটিমাত্র নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় স্থির রাখা যায় নি। 'Absolutism'-এর বিপরীত তত্ত্বরূপে উদ্ভূত হলেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা-পরম্পরায় কিন্তু 'Absolutism' বিরোধিতাই 'মানবিকতা'-

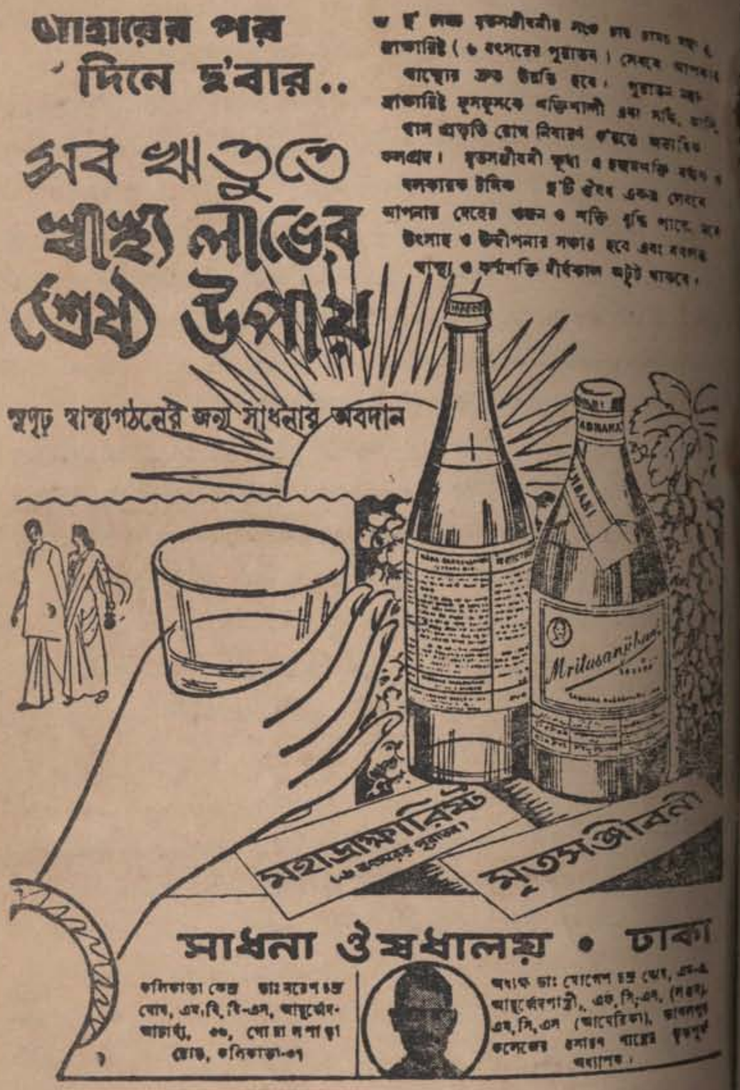
বাদের বিশিষ্ট লক্ষণরূপে পরিগণিত হয় নি। "This philosophic usage of humanism clearly does not involve my antagonism to absolutism." (*Encyclopaedia of Social Sciences*)। আরও, ধর্মবিরোধিতাও যে 'মানবিকতাবাদ'-তত্ত্বের কোনো মৌলিক ভূমি নয় তার প্রমাণ, Santayana'র 'Realm of Matter'। বস্তুত, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক উভয়দিক থেকেই 'মানবিকতাবাদ' এক বহুধারা স্রোতঃস্বিনী। Adam Schaff তাঁর বই-এর 'Socialist humanism and its forerunners' নামক অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোচনা করে, মার্কসীয় চিন্তাধারায় অধুনাবিস্মৃত এক গুরুত্বপূর্ণ দিককে সংযোজিত করেছেন। এর জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ, বিশুদ্ধবাদী'দের রোষ সত্ত্বেও।

'Humanism' ও 'Humanitarianism'-এর তুলনাতেও শ্রীরুদ্রের সমালোচনার মধ্যে আত্মতুষ্ট ন্যায়পরায়ণতার (Self-righteousness) সুর প্রচ্ছন্ন। তাঁর জানা আছে কিনা জানি না যে ইরাসমাস প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র 'humanist' রেনেসাঁস-উত্তর সমাজে নতুন গরীবদের জন্য কাতর হয়ে তাদের দুঃখ লাঘব করতে এগিয়ে এসেছিলেন ; 'খাঁটি' 'humanist'-রা কিন্তু এ থেকে অনেক দূরে, অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। অথচ, সমাজতান্ত্রিক মানবিকতার ঐতিহ্যে ঐ 'জীবে দয়া' শ্রেণীভুক্ত 'humanist'দের স্থানই স্বীকৃত। *Encyclopaedia of Social Sciences* থেকে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। "The persistent struggles that brought about better conditions of life for the mass of people were not carried on by persons imbued with a humanistic view of life ; their interests were too aristocratic and individualistic, their eyes were turned too much towards the past and upon themselves."

সমাজতান্ত্রিক মানবিকতার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করার জন্য, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংগঠনকে 'মানবিকতা'-হীন ছাঁচে-ঢালাই যান্ত্রিকতার অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন মানবিকতার বিচিত্র ঐতিহ্যের মধ্যে এর নিজস্ব বিশিষ্টতার অনুসন্ধান। Adam Schaff সমাজতান্ত্রিক মানবিকতার নতুনকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েই পাঠককে স্মরণ করিয়েছেন যে এই মানবিকতা কোনো স্বয়ম্ভূ-অর্থে নতুন নয়, একে এর নতুনত্বের পরীক্ষা দিতে হবে সনাতন ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠকে অতিক্রম করে।

সিতাংশু ভট্টাচার্য




আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়
সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা


আষাঢ়
১৩৭১